~*MASUD RANA SERIES*~

Bondhu By Kazi Anwar Hossain

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

বন্ধু

ব্যাঙ্ককে ডেকে পাঠানো হলো মাসুদ রানাকে। সোহেলের কাছে রিপোর্ট করল সে। সোহেল ওকে তৈরি করতে বলল ওরই এক অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হত্যা করার অব্যর্থ পরিকল্পনা। ব্যাপারটা কি!—ভাবছে রানা। সর্বক্ষণ ওকে অনুসরণ করছে কেন তিনজন বাঙালী? মেয়েটারই বা মতলব কি? কি চায়?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

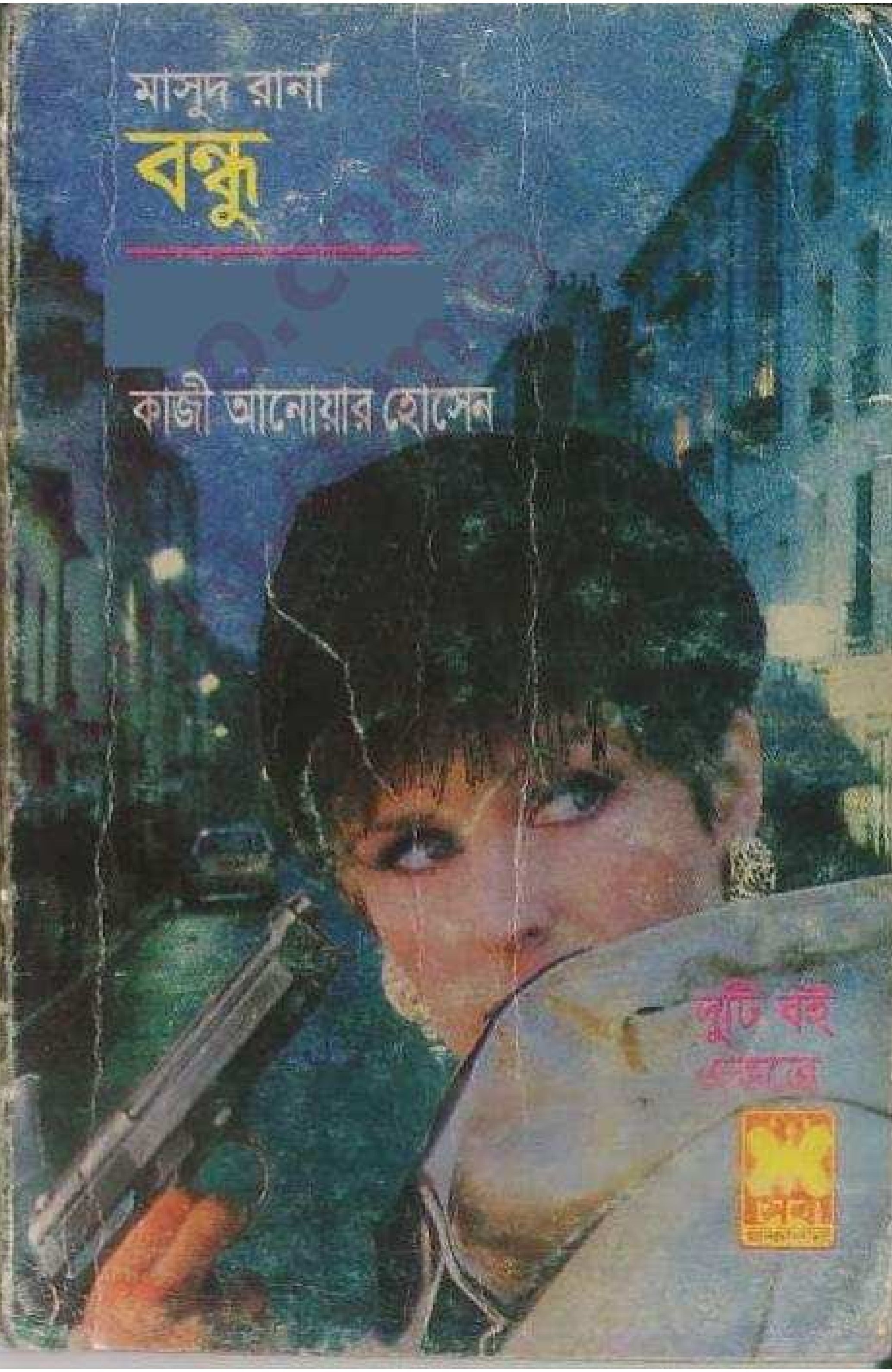

বন্ধু

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

এক

রিকশা থেকে নেমে সুই সুক স্ট্রী-তে ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। সরু রাস্তা, দু'পাশে গায়ে গায়ে লেগে থাকা আলো ঝলমলে দোকানপাট। সন্ধে নামছে, মাথার ওপর লম্বা একফালি বিবর্ণ আকাশ।

জুয়েলারির দোকানটা ছোট কিন্তু পরিপাটি করে সাজানো। ভেতরে ঢুকেই দু'ধরনের আওয়াজ পেল রানা। ওপর তলার কোথাও গিটার বাজাচ্ছে কেউ। দোকানের ঠিক পিছন থেকে আসছে ঠুক ঠাক ঠোকাঠুকির শব্দ। তার মানে কারখানা আর বাসাবাড়ি নিয়ে দোকান। কাউন্টারের ওদিকে ওঅর্ক-বেঞ্চে বসে সোনার আঙটিতে একটা ওপ্যাল পাথর বসাচ্ছে থুথুড়ে এক বুড়ো। দোকানে আর কাউকে দেখা গেল না।

'আসসালামোআলেকুম!'

শেড পরানো ল্যাম্পের আলোয় ঝিক করে উঠল ওপ্যাল। ভুরু কুঁচকে মুখ তুলল বুড়ো। 'ওয়ালেকুমসালাম।'

'মি. লিয়েন মনতাজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কালো মখমলের ওপর আঙটি রেখে রানার সাথে করমর্দন করল বুড়ো। চোখ যেন একজোড়া সার্চলাইট, রানার চেহারা ও কাপড়-চোপড় খুঁটিয়ে দেখে নিল। অ্যাশ কালারের কমপ্লিট স্যুট পরেছে রানা, লাল টাই, পায়ে চকচকে কালো জুতো। মৃদু একটু হেসে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো, যেন এই পোশাক পরা একজন লোককেই আশা করছিল সে। 'ইয়েস।'

'আমার একটা অর্ডার ছিল,' বলল রানা।

'ইয়েস?'

সাঙ্কেতিক শব্দটা ব্যবহার করল রানা, 'ব্লাডস্টোন।'

সমীহের সাথে মাথা নিচু করে বাউ করল বুড়ো মনতাজ, রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল খোলা দরজার দিকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে, ডানে বাঁয়ে তাকাল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'কারিগরের একটা হাত নেই কিনা, খুব ঢিমে তালে কাজ করে, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আসুন।'

মনতাজের পিছু পিছু দোকানের পিছনে সরু একটা প্যাসেজে চলে এল রানা। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ও। ছিল প্যারিসে, বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদের মেসেজ পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি ব্যাংককে চলে এসেছে। জরুরী তলবের কারণ হিসেবে মেসেজে কিছু বলা হয়নি। এই জুয়েলারি দোকানের ঠিকানা,

মালিকের চেহারার বর্ণনা আর সাঙ্কেতিক একটা শব্দ জানানো হয়েছে ওকে। উত্তরে লোকটার বলার কথা, আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। 'কারিগরের একটা হাত নেই…' এ-ধরনের কিছু বলার কথা ছিল না। কথাটার নিশ্চয় কোন তাৎপর্য আছে। সোহেলের একটা হাত নেই…তবে কি সে নিজেই ওর সাথে কথা বলার জন্যে ব্যাংককে আসছে? তা যদি হয়, ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর না হয়েই যায় না। বিশেষ জরুরী কিছু ঘটলেই শুধু দেশের বাইরে পা দেয় চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

বিপজ্জনক একটা অ্যাসাইনমেন্টের আশায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রানা।

একটা সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা। গিটারের আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুড়ো মনতাজের পিছু পিছু খোলা একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ঘরের বেশির ভাগ জায়গা দখল করে আছে কেবিনেট আর সেল্ফ, কোন রকমে ঠাঁই করে নিয়েছে একটা ছোট টেবিল আর একটা চেয়ার। দেয়ালগুলো পাতলা কাঠ দিয়ে মোড়া। টিউব লাইটের প্রায় সবটুকু আলো গিয়ে পড়েছে রোজ-উড দিয়ে তৈরি একটা বুদ্ধ-মূর্তির ওপর।

রানার দিকে ফিরে আবার একবার মাথা নিচু করে বাউ করল বুড়ো মনতাজ। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ হতেই চারদিকে আরেকবার চোখ বুলাল রানা। তিনটে জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করল ও। ঘরে একটা টেলিফোন আছে। মূর্তির পাশেই আরেকটা দরজা, এবং কামরার একমাত্র জানালা। এই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে সরাসরি রাস্তায় বেরোনো যায়। বাড়ির সামনের অংশ থেকে এই ঘর অনেকটা দূরে হলেও, কারখানার ঠুকঠাক আওয়াজ এখান থেকেও পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়।

অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে রানা, ক্লান্ত। কি কাজে ডাকা হয়েছে জানে না, তাই কিছুটা উদ্বিগ্নও। টের পাবার আগেই একটা গুলি ছুটে এসে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিক, তা চায় না ও। চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দেয়ার চিন্তাটা বাতিল করে দিল, দরজার দিকে কান আর জানালার দিকে একটা চোখ রেখে ডিসপ্লে কেসগুলোর সামনে দাঁড়াল ও। গাঢ় নীল রঙের ল্যাপিস-ল্যাজিউলি, রোজ কোয়ার্টজ, অবসিডিয়ান, মুনস্টোন, হরেক রকম হীরে আর মুক্তো। জায়গাটা স্রেফ একটা ফ্রন্ট নয়, সত্যিকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। বুদ্ধ-মূর্তির পাশের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। গম্ভীর চেহারা। বামহাতটা ট্রাউজারের পকেটে। কোটের বাটন হোলে লাল একটা গোলাপ। দরজা বন্ধ করে রানার দিকে ফিরল সোহেল আহমেদ। 'কখন পৌঁছেছিস?' খালি চেয়ারটায় বসে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ড্রাম বাজাতে শুরু করল হাতলে।

'কোথায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'এখানে, না ব্যাংককে?'

'থাইল্যান্ডে।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ঘণ্টাখানেক আগে।' টেবিলের ওপর কনুই রাখল ও। 'কি এমন ব্যাপার যে তোকেই আসতে হলো?'

কোটের সাইড পকেট থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেট আর লাইটার বের করল সোহেল। রানার প্রশ্ন এড়িয়ে জানতে চাইল, 'প্যারিসে যে কাজটা করছিলি, সেটার খবর কি?'

রানাও প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, তোর একটা হাত ছিল না। সেটা আবার গজাল কিভাবে?'

'আর্টিফিশিয়াল।'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'তোর গম্ভীর গম্ভীর ভাবটুকুর মতই। তাই না?'

'গম্ভীরা কই, না!' যদিও সোহেলের চেহারায় গাম্ভীর্যের মুখোশ অটুট রইল। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট আর লাইটারটা টেবিলের ওপর ঠেলে দিল রানার দিকে। 'নে, খা।' জানে, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে রানা। কে কার সিগারেট ধ্বংস করবে তাই নিয়ে এক সময় মারপিট লেগে যেত ওদের মধ্যে।

শান্তভাবে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল রানা। তাই দেখে বিস্ময় ও সতর্কতার ভাব ফুটল সোহেলের চেহারায়। সিগারেটের প্যাকেট খুলে রানা ভেতরে তাকাল দেখে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সে, 'খাবি নাকি রে?'

'আরে না!' হাসল রানা। প্যাকেটের ভেতর থেকে দৃষ্টি তুলল। 'মাত্র তিনটে খেয়েছিস দেখছি।'

রানা খাবে না শুনে ভয় মুক্ত হলো সোহেল। গম্ভীর সুরে কাজের কথা পাড়ল সে। 'প্যারিস অ্যাসাইনমেন্টের রিপোর্ট পরে দিলেও চলবে…'

'জিনিসটা কিন্তু বিষ,' সোহেলকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'খাওয়া উচিত নয়।'

চটে উঠল সোহেল। 'আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না…'

'কে বলল আমি তোর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছি?' জানতে চাইল রানা। 'নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাবছি আমি।'

'মানে?'

'মানে সিগারেটের ধোঁয়া মাত্রই ক্ষতিকর,' বলল রানা। প্যাকেটটা বন্ধ করল ও। 'এই যে তুই খাচ্ছিস, তাতে আমারও ক্ষতি হচ্ছে কথাটা মানিস?'

আবার সতর্ক ভাব ফুটল সোহেলের চেহারায়। 'দেখো, শালক, আমরা এখানে একটা কাজের কথা আলোচনা করতে বসেছি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে লেকচার তোর কাছ থেকে নয়, পাস করা একজন ডাক্তারের কাছ থেকেই শুনতে পছন্দ করি আমি। দে।' হাত বাড়াল সে।

প্যাকেটটা নিজের সামনে টেবিলের ওপর রাখল রানা। 'সিগারেটের ধোঁয়া ক্ষতিকর, এটা বুঝতে ডাক্তারের লেকচার লাগে না। কথাটা তুই স্বীকার করিস কিনা, আমি শুধু এটুকু জানতে চাই।'

'ঠিক আছে, মানলাম—ক্ষতি করে…'

সিগারেটের প্যাকেটের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা।

স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। এক ঘুসিতেই চ্যাপ্টা হয়ে গেছে প্যাকেট, ভেতরে একটা সিগারেটও যে অক্ষত নেই তা আর বলে

দিতে হয় না। দুর্বোধ্য হাহাকার ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

'থাই না জেনেও অকার করেছিস,' আত্মতৃপ্তির হাসি দেখা গেল রানার মুখে, 'তাই একটু খেসারত দিলি আর কি!'

'আমার সাড়ে বত্রিশ টাকা ধ্বংস করেছিস,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সোহেল। 'আমার নাম যদি সোহেল হয়, মনে রাখিস, এই টাকা আমি আদায় করে ছাড়ব।'

'কাজের কথা হোক।' প্রস্তাব করল রানা, মিটি-মিটি হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'লিয়েন মনতাজ কে?'

'কন্ট্যাক্ট নয়,' দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে বসে থাকার পর গম্ভীর সুরে বলল সোহেল। 'ওর এই দোকান-কাম বাড়িটাকে সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করছি আমরা। মাঝে মধ্যে আমরা হয়তো দূতাবাসে দেখা করতে পারব, কিন্তু বেশিরভাগ কাজ এখানে বসেই হবে।'

'একজন মুসলমানের ঘরে বুদ্ধ-মূর্তি কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বাড়ির মালিক একজন বৌদ্ধ, মনতাজ ভাড়াটে।'

'এবার বল, কেন এই জরুরী তলব? এটা কি একটা অ্যাসাইনমেন্ট?'

অ্যাসাইনমেন্টের গন্ধ পেলে রানা কি রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সোহেল তা জানে। বলল, 'ধীরে, বন্ধু, ধীরে! এত ব্যস্ততার কারণ নেই।'

চটে উঠল রানা। 'তার মানে? সাত হাজার মাইল দূর থেকে টেনে এনেছিস আমাকে, আর এখন বলছিস ব্যস্ততার কোন কারণ নেই?'

'নেই, তুই যখন পৌঁছে গেছিস।'

ভুরু কুঁচকে কথাটার অর্থ বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। জানতে চাইল, 'কাজটা কি বলবি?'

'তার আগে প্রাসঙ্গিক দু'একটা কথা সেরে নিই,' বলল সোহেল। রানার অস্থিরতাটুকু উপভোগ করছে সে। 'স্থানীয় এমন সব লোকের সাথে কাজ করতে হবে তোকে, থাই ছাড়া অন্য কোন ভাষার একটা শব্দও বোঝে না যারা। কাজেই যতটুকু জানিস এখন থেকে থাই ব্যবহার করতে শুরু কর। কতটুকু জানিস?'

'চালিয়ে নিতে পারব।'

'ব্যাংককে তুই আগেও এসেছিস, শহরটা ভাল করে চিনিস তো?'

'শেষবার এসেছিলাম দু'বছর আগে। শহর অনেক বদলে গেছে। তবে হারিয়ে যাব না।' এক সেকেন্ড থেমে জানতে চাইল, 'বুড়ো মনতাজ সম্পর্কে আরও কিছু জানাতে পারবি?'

'আমি নিজেও বিশেষ কিছু জানি না,' বলল সোহেল। 'ওর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে দূতাবাস থেকে।'

'তুইও জানিস, দূতাবাসে ফুটো থাকে, মানে, থাকতে পারে।'

'মনতাজকে আমরা চেক করেছি। দুই পুরুষ আগে খাস ঢাকার বাসিন্দা ছিল পরিবারটি। বুড়োর বাপের দাদা ব্যবসা করতে এসে আর ফিরে যায়নি। এই রকম আরও অনেক পরিবার আছে ব্যাংককে। এর আগেও ছোটখাট

কাজে এর সাহায্য পেয়েছি আমরা।'

'কিন্তু এই বয়সের একজন লোক নিশ্চয়ই এজেন্ট হতে পারে না।'

'তা সে নয়ও।'

'কেউ আমার পিছু নিয়ে এসেছে কিনা সেটা পরীক্ষা করল।'

'সাবধানী লোক।'

কাঠের সিঁড়িতে হালকা পায়ের আওয়াজ শুনে চুপ করে গেল ওরা। একটু পর নক হলো দরজায়।

'কাম ইন,' বলল সোহেল।

হাতে একটা সিলভারের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল কিশোরী এক মেয়ে। ওদের দু'জনের দিকে একবার করে তাকিয়ে মৃদু হাসল। এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল ট্রে। মাথা নিচু করে বাউ করল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলল দরজার দিকে।

পিছন থেকে বলল রানা, 'সিটারে তোমার হাত খুব মিষ্টি লাগল।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরী, মরাল গ্রীবা বাঁকা করে আনত চোখে তাকাল নিজের কাঁধে। তার মুখের একটা পাশ শুধু দেখতে পেল ওরা। লাজুক হাসি ফুটল কিশোরীর মুখে, দ্রুত মাথা নেড়ে ব্যাপারটা অস্বীকার করল সে, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

চোখাচোখি হতে মুচকি একটু হাসল সোহেল, ট্রে থেকে কফির কাপ তুলে নিতে নিতে বলল, 'সোহানা তোকে একটা মেসেজ দিয়েছে···পরে শুনিস। তার আগে কাজের কথা। তুই জানিস, চলতি হপ্তার শেষের দিকে মধ্যপ্রাচ্যের একজন হোমরাচোমরা কর্মকর্তা বাংলাদেশ সফরে আসছেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'খবরের কাগজ পড়িস না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সময় পেলে পড়ি। তুই মাস্টারি ছাড়বি?'

'উনি থাইল্যান্ড হয়ে বাংলাদেশে যাবেন,' বলল সোহেল। 'বাংলাদেশে এটা তাঁর সরকারী সফর। এখানে তাঁর এই সফর বেসরকারী হলেও, থাই কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর বৈঠক হবে, কয়েকটা চুক্তিতে সইও করবেন। ব্যাংককে তিনি রাজার ব্যক্তিগত মেহমান হিসেবে রাজপ্রাসাদে উঠবেন।'

'নাম?'

'তোর বিশেষ বন্ধু,' বলল সোহেল। 'সউদী প্রিন্স ফরহাদ।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার। 'আচ্ছা?' তারপর জানতে চাইল, 'তা সমস্যাটা কি?'

'তার আগে প্রিন্সের এই সফরের গুরুত্বটুকু বুঝতে হবে তোকে,' বলল সোহেল। 'থাইল্যান্ডে তিনি আসছেন এখানকার মুসলমানরা কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার জন্যে। কয়েকটা ইসলামিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্যও দেবেন। তাঁর থাই-সফরের সাথে রাজনীতির তেমন কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কিন্তু তাঁর বাংলাদেশ সফরের সাথে রাজনীতি এবং অর্থনীতি, দুটোই জড়িত।'

'কি রকম?'

'সউদী আরব নানাভাবে সাহায্য করে আসছে বাংলাদেশকে,' বলল সোহেল। 'কিন্তু দু'পক্ষের মধ্যে জমজমাট ব্যবসা এখনও জমে ওঠেনি। যেমন পানির কথাই ধর। এশিয়ারই একটা দেশ থেকে সউদী আরব খাবার পানি কেনে। কিন্তু এই পানি আমরাই সাপ্লাই দিতে পারি। এই রকম আরও অনেক কিছু অনেক দেশ থেকে চড়া দামে কেনে ওরা, অথচ আমরা অনেক কম দামে সেগুলো দিতে পারি ওদের। ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন ধরনের অর্থ সাহায্যের চেয়ে বাংলাদেশ চাইছে ব্যবসা করে দু'পয়সা কামাতে। কিন্তু মুশকিল হলো, দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি এবং রাজনৈতিক কারণে এতদিন ওরা আমাদের প্রস্তাব সবিনয়ে এড়িয়ে গেছে। প্রিন্স আসছেন, এই সুযোগে নতুন করে প্রস্তাব দেব আমরা। এবার আমরা নাছোড়বান্দা, রাজি করিয়ে তবে ছাড়ব।'

'কিন্তু এসবের সাথে আমাদের···আমার কি সম্পর্ক?' অবাক দেখাল রানাকে।

উত্তরটা এড়িয়ে সোহেল বলল, 'ব্যাংকক সফরের সময় প্রিন্স ফরহাদ একটা দিন পোলো খেলবেন, একটা দিন ইয়ট ক্লাবে কাটাবেন। তাঁকে নিয়ে একটা মোটর শোভাযাত্রাও হবে। খোলা একটা মোটরে থাকবেন তিনি। ইসলামিক ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনে যাবেন। ইসলামিক আই হসপিটালও ভিজিট করবেন।'

'বেশ বুঝলাম। কিন্তু···'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল সোহেল, তারপর গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে বলল, 'আমরা চাই, তাঁর এই সফরের সময় তাঁকে খুন করার একটা প্ল্যান তুই আমাদের তৈরি করে দিবি।'

দুই

ট্যাঙ্কের কিনারা ঘেঁষে ঘুরছে মাছ দুটো, মাথা একটু বাঁকা করে পরস্পরকে লক্ষ করছে ওরা। ছোটটা বেশি সুন্দর, তার গায়ের রঙ বড়টার চেয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু দুটোরই রয়েছে জমকালো, চোখ-জুড়ানো ডানা। স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে রঙধনুর মত লাগছে ওদেরকে। ট্যাঙ্কের কাঁচের আবরণে উত্তম আবদুল্লার গোল চাঁদপানা মুখের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

বাতাসে এয়ারকন্ডিশনের তাজা গন্ধ।

হঠাৎ করে দুটো মাছ একই সাথে পরস্পরের দিকে ছুটে গেল। দুরন্ত গতি, চোখে খুনের নেশা। সংঘর্ষের ঠিক আগের মুহূর্তে গায়ের সাথে সেঁটে গেল ডানা। আহত বা ছেঁড়া একটা ডানা ভারসাম্য নষ্ট করবে, ফলে

তাৎক্ষণিক ও নির্ঘাত মৃত্যু ঘটতে পারে।

উত্তম আবদুল্লার চোখ দুটো নিষ্পলক।

পাশ ঘেঁষে যাবার সময় বড় মাছটার পাঁজরে লম্বা একটা আঁচড় কেটে দিয়ে গেছে ছোটটা। ঝকঝকে ডানা মেলে দিয়ে ট্যাঙ্কের কিনারা ঘেঁষে আবার ঘুরছে তারা। পরবর্তী আক্রমণটা হলো ধীরস্থির ভাবে, কিন্তু মরণপণ। সতর্কতার সাথে পরস্পরের দিকে এগোল তারা, মুখোমুখি থামল, ডানাগুলো সেঁটে গেল গায়ের সাথে, তারপর ধারাল দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল একজন আরেকজনের ওপর। একটা ঘূর্ণির মধ্যে ডিগবাজি খেল ওরা। সাদা পানি লাল হয়ে উঠল। হয় মারবে নয় মরবে, কেউ রাজি নয় আপোসে।

পর পর তিনবার হামলা চালাল ওরা। পানি এখন গোলাপী হয়ে উঠেছে। কাঁচের ওপর উত্তম আবদুল্লার প্রতিবিম্ব আগের চেয়ে উজ্জ্বল লাগছে।

রক্তের একটা বিস্ফোরণ ঘটল ট্যাঙ্কের মাঝখানে। অলস ভঙ্গিতে নিচ থেকে ওপর দিকে উঠছে লাল রঙ, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পানির ওপর ভেসে উঠল মাছটা, লাল পানিতে চকচক করছে রুপালি পেট। এটা সুন্দর, ছোটটা।

ট্যাঙ্কের দিকে পিছন ফিরল উত্তম আবদুল্লা। হাতে বানানো সিগারেটটা নিভে গেছে, তাতে আগুন ধরিয়ে বলল, 'ওর নাম অসুর। পর পর সাতটা যুদ্ধ জিতেছে। মাইপুরীর গোল্ডেন প্রিন্সও খুন হয়ে গেছে ওর হাতে।'

মাছের এই লড়াই দেখার নিমন্ত্রণ, বিদেশীদের জন্যে এটা এক দুর্লভ সম্মান। 'দারুণ,' বলল রানা। 'মুগ্ধ হবার মতই।'

রানাকে ইঙ্গিত দিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে এসে একটা সোফায় বসল উত্তম আবদুল্লা। তার সামনের একটা সোফায় বসল রানা। হাত বাড়িয়ে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল আবদুল্লা। সাথে সাথে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল উর্দি পরা এক লোক।

'দাফনের ব্যবস্থা করো,' বলল আবদুল্লা। 'অনুষ্ঠানে আমিও থাকব।'

লোকটা চলে যেতে রানার দিকে ফিরল আবদুল্লা। 'আপনি যাঁর কাছ থেকে এসেছেন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার ঠিক কি ধরনের সাহায্য দরকার, আমাকে জানানো হয়নি।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ব্যবসা করে উত্তম আবদুল্লা, অর্থাৎ চোরাচালানীদের একজন। চাও ফারায়া নদীর কিনারে যে-সব ওয়ার হাউস রয়েছে সেগুলোর মাঝখানে যোগাযোগ সেতু হিসেবে তার একটা ভূমিকা আছে। সোহেলের কাছ থেকে লোকটা সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানতে পারেনি ও। সোহেলের ধারণা, লোকটা ওদের খুব কাজে লাগবে। বেআইনী আফিমের জমজমাট ব্যবসা রয়েছে ব্যাংককে, প্রায় সব ক'জন এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায়ীই এর সাথে জড়িত। বেশির ভাগ নদীর মত চাও ফারায়াও সাগরের সাথে গিয়ে মিশেছে। লোকটা ওদের কি কাজে লাগবে তা ব্যাখ্যা না করলেও সোহেল জানিয়েছে, উত্তম আবদুল্লা লোকটা তথ্যের একটা ডিপো, টাকার বিনিময়ে তথ্য বিক্রি করা তার একটা সাইড

বিজনেস। লোকটা অত্যন্ত গর্বের সাথে বলে বেড়ায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বা কিছু পরে মিত্র বাহিনীর জাঁদরেল সব অফিসারদের সাথে কাজ করেছে সে, তাঁদের মধ্যে মেজর জেনারেল রাহাত খানও ছিলেন। মেজর জেনারেলকে তার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি শুধু নামটা স্মরণ করতে পেরেছেন। উত্তম আবদুল্লার কাছ থেকে বি.সি.আই. এর আগে কোন তথ্য কেনেনি।

সেফ হাউস সুই সুক থ্রী-তে তারপরেও আধঘণ্টা কথা হয়েছিল ওদের। প্রিন্স ফরহাদকে খুন করার প্ল্যান চেয়ে চুপ মেরে গিয়েছিল সোহেল। রানা কিন্তু একটুও চমকায়নি। জানতে চেয়েছিল, 'তুই বলতে চাইছিস, প্রিন্সকে খুন করার জন্যে আমি একটা প্ল্যান দিলে তুই সেটাকে নস্যাৎ করার ব্যবস্থা নিতে পারবি, এই তো? যারা প্রিন্সকে খুন করার কথা ভাবছে তারা কিভাবে এগোবে, আমার প্ল্যানটা দেখে সে-সম্পর্কে ধারণা পেতে চাস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেমানুষি।'

'কেন?'

'একজন লোককে খুন করার হাজারটা প্ল্যান করা যায়।'

'কিন্তু আমার ধারণা, তুই যে প্ল্যানটা করবি সেটা হবে সবচেয়ে নিখুঁত, নিশ্ছিদ্র—তাতে থাকবে দক্ষতা আর মুন্সিয়ানার পরিচয়। আমরা আন্দাজ করছি, প্রিন্সকে খুন করার জন্যে তোর মতই একজন এক্সপার্ট প্রফেশনালকে পাঠানো হবে। তার আর তোর প্ল্যান দুটো একই রকম হতে বাধ্য।'

'তার আগে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আয় আমাকে,' বলেছিল রানা। 'প্রিন্সকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সফরটা বাতিল করে দিলেই তো হয়।'

'বোকার মত কথা বলিস না! কেউ হুমকি দিলেই যদি সফর বাতিল করা হয়, তাহলে তো হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে সবাইকে। বিপদ সম্পর্কে সামান্য একটা আভাস দেয়া হয়েছে প্রিন্সকে, তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন: আমার বিপদ হতে পারে, এই খবরটা আমার এক বন্ধু আছে তাকে শুধু একটু জানিয়ে দাও।'

এর আগেও প্রিন্সকে একবার বাঁচিয়েছে রানা। প্রিন্সের মেহমান হয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে বাঘ মারতে গিয়েছিল ও। বিপদটা বাঘের তরফ থেকে নয়, এল একজন স্নাইপারের কাছ থেকে। সূর্যের উল্টোদিকে ও উঁচু একটা জায়গায় ছিল লোকটা, তার টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেলে রোদ লেগে ঝিক করে উঠেছিল। রানার হাতেও দূরপাল্লার রাইফেল। দু'জন প্রায় একই সাথে গুলি করে ওরা। কিন্তু রানা যদি গুলি করার আগের মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে প্রিন্সকে ফেলে না দিত, শেষ রক্ষা হত না।

ম্লান একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। বন্ধু হিসেবে প্রিন্সকে সবদিক থেকেই আদর্শ বলা যায়, কিন্তু মাঝেমধ্যে ওর ওপর বড় বেশি নির্ভর করে সে। লোকজনকে বলে বেড়ায়: রানা? ও তো জাদুকর!

'এটা একটা সিকিউরিটি জব,' বলছিল সোহেল। 'সউদী গোয়েন্দা দফতর থেকে বেশ কয়েকজন অফিসারকে এরই মধ্যে পাঠানো হয়েছে ব্যাংককে। প্রিন্সের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বডিগার্ডরাও থাকবে। থাই হোম অফিস আমাদের সাথেও সহযোগিতা করছে। কিন্তু...'

'তার আগে,' বলল রানা, 'হুমকিটা সম্পর্কে একটু খুলে বল আমাকে।'

'সাধারণ খামে, ইংরেজীতে লেখা একটা চিঠি সউদী হোম অফিসে পৌঁছে দেয়া হয়েছে,' বলল সোহেল। 'বলা হয়েছে, ব্যাংককে প্রিন্স এলে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। সউদী গোয়েন্দা বিভাগ আর থাই সি.আই.ডি. চিঠিটা পরীক্ষা করছে।'

'আমার কাজ করার স্বাধীনতা এখানে কতটুকু?'

'সম্পূর্ণ একা কাজ করবি তুই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে।'

'আমি জানতে চাইছি, থাই বা সউদী গোয়েন্দা অফিসাররা আমার কাজে নাক গলাবে কিনা।'

'পরিস্থিতি সম্পর্কে বলছি আমি, সব তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে তোর কাছে। থাই এবং সউদী অফিসাররা প্রিন্সের নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করবে। ওরা চাইছে, কেউ যেন ওদের কাজে নাক না গলায়, বা বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। বাংলাদেশ দূতাবাস এ-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, এবং বি.সি.আই.-এর একজন এজেন্টকে ব্যাংককে নিয়ে আসা হচ্ছে, এসব খবর শুনে বিরক্ত বোধ করেছিল ওরা। কিন্তু যখন শুনল প্রিন্স নিজে ওই এজেন্টকে এখানে চান, আপত্তি করতে পারেনি। তবে বলে দিয়েছে, তুই যদি ওদের কাজে নাক না গলাস, ওরাও তোর কোন কাজে নাক গলাবে না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এবার তুই আমাকে ব্রিফ কর।'

'তা করছি,' বলল সোহেল। 'কিন্তু তোকে দেয়ার মত আসলে তেমন কোন তথ্য নেই আমার হাতে। ফরেন অফিস থেকে ইনফরমেশন আসা শুরু হোক...'

উত্তম আবদুল্লা খুক্ করে কেশে উঠে বর্তমানে ফিরিয়ে নিয়ে এল রানাকে। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে একটু হাসল রানা। সোহেল উত্তম আবদুল্লার মত লোকের কাছে কেন তাকে পাঠিয়েছে, উপলব্ধি করা কঠিন নয়। আধুনিক মানুষ টাকার জন্যে ভয়ঙ্কর সব ঝুঁকি নিতে পারে, তারচেয়েও বেশি ঝুঁকি নেয় সেক্সের ব্যাপারে—কিন্তু তার যদি ড্রাগের ওপর আসক্তি থাকে, সব একেবারে লেজে-গোবরে করে ছাড়ে। সাবধান হবার গুরুত্ব কতখানি ভুলে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ, বিক্রি ও সমর্পণ করে দেয় উত্তম আবদুল্লার মত লোকদের কাছে। এই সূত্রেই সমাজের কুখ্যাত সব লোকের সান্নিধ্য উপভোগ করে আবদুল্লা। বলাই বাহুল্য ড্রাগই তার অন্যতম সাইড বিজনেস।

প্রশ্নের উত্তরে রানা বলল, 'চলতি মাসের উনত্রিশ তারিখে ব্যাংককে একজন মুসলমানের রক্ত ঝরুক, আমরা চাই না।'

রানার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল আবদুল্লা। তারপর

গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমিও তা চাই না। কিছু ঘটার আগেই আপনারা মাঠে নেমেছেন, এটা একটা শুভ লক্ষণ। আশা করি ঠেকাতে পারবেন।'

'যদি সুযোগ পাই,' বলল রানা। 'প্রফেশনালরা কোথায়? মানে, তারা কেউ ব্যাংককে আছে?'

'প্রফেশনাল?'

'আমি বারলিঙ্গার, গডলিমো, টোটা এদের কথা জানতে চাইছি।'

'এবং হিনো, খেমরান এদের কথা?'

স্বস্তি বোধ করল রানা। 'হ্যাঁ।'

'হিনো রোমে,' বলল আবদুল্লা। 'ভীষণ ঝামেলায় আছে, তার কথা বাদ দেয়া যেতে পারে।'

'বারলিঙ্গার?'

'এথেন্সের জেলখানায়। ওর লোকেরা ওকে বের করে আনছে, কিন্তু হপ্তা তিনেকের আগে পারবে না। কাজেই ওকেও বাদ দেয়া যায়।'

'গডলিমো?'

কালো আলখাল্লার পকেট থেকে হাত দুটো বের করে উঠে দাঁড়াল উত্তম আবদুল্লা। পায়চারি শুরু করল। 'গডলিমো কোথায় থাকে কেউ কোনদিন জানতে পেরেছে?'

'খেমরান? রিভিয়েরা? টোটা, দি মঙ্গোলিয়ান?'

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে আবদুল্লা বলল, 'সময়মত আপনার সাথে আমি যোগাযোগ করব। তথ্যটা আপনার খুব দরকার, এ-কথা আমার মনে থাকবে।'

'কিন্তু...'

'আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হোটেল ইন্টারকনে।'

আবদুল্লার পিছু পিছু দরজার দিকে এগোবার সময় রানা লক্ষ করল, ট্যাঙ্কের পানি বদলে দেয়া হয়েছে। ছয় ইঞ্চি লম্বা কড়ধনু আকৃতির খুনী মাছটা একাকী, সাঁতার কাটছে। সন্দেহ নেই, একজন প্রফেশনাল।

দুটো দিন শহর দেখে কাটাল রানা। এই দু'দিন কেউ ওকে ফলো করেনি। উত্তম আবদুল্লা নিরাশ করেছে ওকে, ওর সাথে এখনও যোগাযোগ করেনি সে। বোঝাই যায়, প্রফেশনালরা কে কোথায় আছে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করতে পারেনি।

কেন যেন প্রথম থেকেই মনে হয়েছে রানার, মিশনটা সম্পর্কে সব কথা খুলে বলেনি ওকে সোহেল। তার সাথে দেখা করে প্রশ্ন করার একটা তাগিদ অনুভব করছে ও। কিন্তু সেফ হাউসে গিয়েও তার সন্ধান করা গেল না। অগত্যা দূতাবাসে হাজির হলো ও।

ওয়েটিং রুমে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর এক বয়স্কা মহিলা দেখা

করলেন। 'রুম সিক্সে যেতে চাই আমি,' বলল রানা।

'রুম সিক্স?' সতর্ক হয়ে উঠলেন মহিলা।

'ওখানে মি. সোহেল আহমেদের থাকার কথা,' বলল রানা।

'আপনার কাগজ-পত্র, প্লীজ?'

কাগজ-পত্র নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন মহিলা। এরপর এল এক যুবতী। অসাধারণ সুন্দরী, কিন্তু সর্বনাশ করেছে দেড় ইঞ্চি চওড়া একটা বিদঘুটে জন্মদাগ। কুচকুচে কালো রঙ ওটার, গায়ে কটা রঙের লোম। তাকালে গা ঘিন ঘিন করে। 'আমি দীনা হক। মি. আহমেদকে আপনার কি দরকার?'

'শুধু তাকেই বলা যাবে,' বলল রানা। 'আছে?'

এদিকে ওদিক মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'দেখা হলে বলবেন, আজ সন্ধের ফ্লাইটে আমি... তেল আবিবে যাচ্ছি।'

'জ্বী? কি বললেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

রিকশা নিয়ে হোটেলে ফিরল ও। বিশ মিনিট পর লবি থেকে টেলিফোন এল। কে একজন দেখা করতে চায়, কিন্তু নাম বলছে না। নাম বলছে না, কাজেই তাকে নিজের কামরায় আনতে চাইল না রানা।

ইন্টারকনের লবিতে কৃত্রিম একটা ফোয়ারা আছে, সেটার পাশে ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। পরনে অ্যাশ কালারের সুট। চকচকে জুতো। অলঙ্কারের বালাই নেই। মেয়েটার দিকে চোখ রেখে এগোল বটে, কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা অন্যদিকে। জায়গাটা নির্জন, কোথাও তেমন কোন শব্দও নেই। ফিস ফিস করে কথা বলল মেয়েটা।

'আপনার কোডনেম ব্যবহার করতে পারি?'

'আপনি জানেন না,' বলল রানা।

'এম. আর. নাইন।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, সোহেলকে একহাত নিতে হবে।

'আমি দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছি,' বলল মেয়েটা। 'দূতাবাসেই আপনাকে আমার চেনা উচিত ছিল।'

'আপনি কি? মানে, দূতাবাসে আপনি কি করেন? রুম সিক্সের কাজ কি? রুম সিক্সের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?'

জলতরঙ্গের শব্দ শুনল রানা। 'একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন হয়ে গেল না?'

কালো জন্মদাগটার দিকে নিজের অজান্তেই চোখ পড়ল রানার। 'দীনা কি আপনার আসল নাম?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে ভারি পটু এই মেয়ে। 'আপনি কি সত্যিই তেল আবিবে...?'

'হ্যাঁ,' এবারও মিথ্যে কথা বলল রানা। 'সোহেলের কানে যেন কথাটা

যায়।' তাহলে যেখানেই থাকুক সোহেল, ওর সাথে দেখা করার জন্যে ছুটে আসবে।

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'কফি খাবেন? আপনার রুমে কিংবা রেস্তোরাঁয়?'

'ধন্যবাদ। না।'

'চলি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল লীনা। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে রানা, পারল না। খুব কম মেয়েই এভাবে হাঁটতে পারে। বিশেষ করে যখন সে জানে একজন পুরুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। যা সাধারণত হয় না, মেয়েটার পিঠ আর নিতম্ব দেখে রানার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করছে। মাশাল্লা, শরীর বটে একখানা!

সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরার দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবল রানা, দুঃখ প্রকাশ করতে? বাজে একটা অজুহাত, সন্দেহ নেই। আসলে জানতে এসেছে, সত্যি সত্যি হোটেল ইন্টারকনে সশরীরে সে আছে কিনা। আরও অনেক ভাবে চেক করা যেত, কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চেয়েছে ওরা। কেন? এই কাজটায় কি রকম ব্যবহার শুরু করল সোহেল!

আধ ঘণ্টা পর ফোন এল উত্তম আবদুল্লার। দেখা করতে বলল।

বেশ রাত হয়েছে, কিন্তু দোকানপাট কিছু কিছু এখনও খোলা দেখল রানা। কুণ্ড চুলা রোডে রিকশা থেকে নামল ও, বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে এল। বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছিল উত্তম আবদুল্লা। উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করল।

'আমার কাছে যে তথ্যটা রয়েছে, তার দাম দেড় লাখ বাথ,' বলল সে।

'দরাদরির অবকাশ আছে?'

'দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে অত টাকা সাথে নেই।'

'আপনি কথা দিলেই চলবে।'

দেড় লাখ বাথ অনেক টাকা, ভাবল রানা। দ্বিধায় পড়ে গেল ও। তথ্যটা অত দামী না-ও হতে পারে।

রানার মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে মুখ খুলল আবদুল্লা, 'তিন দিন আগে, প্রফেশনালদের একজন লাওস থেকে মেকং নদী পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ঢুকেছে। আজ রাতে ব্যাংককে আসছে সে।'

সাথে সাথে বুঝল রানা, কম দামেই তথ্যটা বিক্রি করছে আবদুল্লা।

'কে?' জানতে চাইল ও।

'টোটা, দি মঙ্গোলিয়ান।'

খুশি হয়ে উঠল রানার মন। কাজ শুরু করার জন্যে একটা সূত্র তাহলে পাওয়া গেল।

ওরা সবাই এক একজন এক্সপার্ট, যে যার নিজের পদ্ধতিতে কাজ সারে।

গডলিমো শ্বাসরুদ্ধ করে মানুষ মারে, কিন্তু কখনও নিজের হাত ব্যবহার করে না। তার হাতিয়ার হলো নাইলনের মোজা, কখনও কখনও মনোফিলামেন্ট ফিশিং লাইন। এক নম্বর লম্পট, ইউরোপের রাজধানী

শহরগুলোয় কয়েকটা নাইট ক্লাব আছে তার। নিজেকে সে প্রাইভেট অপারেটর বলে। নিজেরা ঝুঁকি নিতে চায় না এমন সব ধনী লোকের হয়ে মেয়েমানুষ আর শিশুদের খুন করে সে। গত বছর ফ্রান্সের সাড়া জাগানো 'ব্লু রুম মিস্ট্রি'-র পিছনে সে-ই ছিল। একজন মা ও তার মেয়ে খুন হয়ে যায়, এদের সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল প্রমাণ হওয়ায় চাকরি হারায় সরকারের পদস্থ তিনজন কর্মকর্তা। গডলিমোর মক্কেল আড়ালেই থেকে যায়, তার সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে পারেনি। শোনা যায়, তার মক্কেল ছিল মন্ত্রীসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য। মা আর মেয়ে নাকি ব্ল্যাকমেইল করছিল মন্ত্রীকে। গডলিমোর কাজে কোন খুঁত থাকে না, কিন্তু তার ফি খুব বেশি।

রাবলিঙ্গার ব্যবহার করে ছুরি। মাত্র দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েই প্রচুর কুখ্যাতি অর্জন করেছে সে। দুটোই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, কিন্তু এমন নিখুঁতভাবে সাজানো যে পুলিস ও কোর্ট ঘটনা দুটোকে আত্মহত্যা বলে রায় দেয়। রাবলিঙ্গারের বৈশিষ্ট্য হলো, ফি হিসেবে কখনও টাকা নেয় না সে, দামী কোন অ্যান্টিক বা বড়সড় কোন সম্পত্তি দিতে হয় তাকে। শোনা যায়, আর্জেন্টিনা আর ভেনিজুয়েলায় পনেরো হাজার একর জমি আছে তার। লোকটা বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না, হার্টের অসুখে ভুগছে।

উন্মাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে হিডিয়ো, কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। তবে একজন লোকের নাম জানিয়ে তাকে যদি খুন করতে বলা হয়, ধরে নিতে হবে লোকটা মারা গেছে। বন্দুক, পিস্তল, ছুরি, বোমা কিংবা খালি হাত, সব ব্যবহার করে সে। দু'বছর আগে মিশরে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টার পিছনে এই হিডিয়ো ছিল। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে কি হবে, এতে প্রচুর অফিসার হয় মারা পড়ে, না হয় গ্রেফতার হয়ে বিচারে মৃত্যুদণ্ড পায়। অর্থাৎ এই সব অফিসারদের নিষ্ক্রিয় করার দায়িত্ব ঠিকমতই পালন করে হিডিয়ো।

জাপানী হিনো একজন টেকনিশিয়ান এবং তার কাজ শতকরা একশো ভাগ নিখুঁত। সায়ানাইড স্প্রে ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহার করে না সে। তিনটে বড় ধরনের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী করা হয় হিনোকে। এর মধ্যে গোল্ড পেন্সিল মার্ডার কেস একটি। পরিত্যক্ত একটা ট্যাক্সিতে পাওয়া যায় ব্রিটেনে তুর্কী অ্যামব্যাসাডরের লাশ। সৌখিন বলে খ্যাতি আছে হিনোর। জাপানে তার মডেল রেলওয়েটাই নাকি সবচেয়ে বড়, কমপিউটারাইজড।

খেমরান মাফিয়ার লোক, তার প্রিয় হাতিয়ার খুদে বোমা। সে বোমার কোন তুলনা নেই। গর্ব করে বলে, ঠিক জায়গা মত বসিয়ে দিলে টার্গেটই শুধু মারা পড়বে, আশপাশে যারা থাকবে তাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না। তার এই দাবি সম্ভবত মিথ্যে নয়। চার্টার অ্যান্ড ইকুইটি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট একটা মীটিংয়ের শুরুতে তার ঝর্ণা কলম খোলার সাথে সাথে বিস্ফোরণের আঘাতে মারা যায়, কিন্তু আর কেউ আহত হয়নি। এর এক বছর পর কিং রিয়াদ আলির সৎ ভাই তার ইলেকট্রিক রেজার এর সুইচ অন করতেই বিস্ফোরণের শিকার হন, কিন্তু এক হাত দূরের কাচের জানালা নাকি অক্ষতই

ছিল।

এরা প্রত্যেকে বিশেষজ্ঞ, যে যার নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে।
টোটো, দি মঙ্গোলিয়ান ব্যবহার করে রাইফেল।

এদের মধ্যে গুতলিমো আর টোটোর কোন ফটো কখনও দেখেনি রানা। উত্তম আবদুল্লা ওর সাথে একজনকে পাঠাল—সম্ভ্রান্ত এক হিন্দু। টোটোকে চিনিয়ে দেবে।

প্রফেশনাল কারাতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে রয়্যাল অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন জিমনেশিয়ামে। সেটা লামপিনি পোলো গ্রাউন্ড থেকে খুব বেশি দূরে নয়। উত্তম আবদুল্লা জানাল, ওখানেই দর্শকদের আসনে পাওয়া যাবে টোটোকে। একটা ফাইট শুরু হবার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় পৌঁছল ওরা। প্রধান ফটকের কাছাকাছি বসল রানা। জায়গাটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ঘামের গন্ধ ঠিকই পাওয়া গেল। প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। রানার গাইড প্রথম কয়েক মুহূর্তে চোরা চোখে এদিক ওদিক তাকাল, তারপর হঠাৎ নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওপর থেকে তিন নম্বর সারিতে রয়েছে, ডানদিক থেকে ষোলো জনের পর। চোখে স্মোকড গ্লাস।' কাঁপা গলা শুনেই বোঝা গেল, টোটোই তার আতঙ্কের কারণ।

ধীরে ধীরে চোখ তুলল রানা। 'তুমি যেতে পারো।'

নড়াচড়া লক্ষ করে এদিকে তাকাতে পারে টোটো, তাই গাইড চলে না যাওয়া পর্যন্ত ফাইটের দিকে চোখ রাখল রানা। তারপর আবার তাকাল টোটোর দিকে। কেউ দেখিয়ে না দিলেও এই লোককে চিনতে পারত ও। চেহারায় এমন এক কর্তৃত্বের ভাব, একবার চোখ পড়লে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই। লম্বা-চওড়া শরীর, কিন্তু এক ছটাক মেদ নেই কোথাও। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো। পরনে সাদা স্যুট। টাইটা গাঢ় নীল রঙের, সোনালি বর্ডার দেয়া। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, কিন্তু ভঙ্গিটা অনায়াস। মাথাটা একদিকে একটু কাত হয়ে আছে। অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই তার, গভীর আগ্রহের সাথে খেলা দেখছে। তার দু'দিকে একজন করে দেহরক্ষী, পরনে ইউরোপিয়ান পোশাক।

চোখ দুটো দেখতে পেলে ভাল হত। পরে দূর থেকে দেখে এই লোককে চিনতে পারতে হবে রানার, হয়তো খুব কম আলোর মধ্যে। চোখ আর হাঁটা, এই দুটোই আসলে গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে রানাকে, টোটোর হাঁটা না দেখে ফিরবে না।

পরস্পরের দিকে তীরবেগে ছুটে গেল দু'জন ফাইটার, ছোঁয়া লাগতেই দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল একজন। দর্শকরা ওদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। এরা দু'জনেই থাই চ্যাম্পিয়ান, প্রিন্সের সম্মানে একটা প্রদর্শনীতে অংশ নেবে। মাঝে মধ্যে টোটোকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখল রানা। নিরেট মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে প্রাণখোলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল একবার। দারুণ উপভোগ করছে সে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে লোকটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা। তার হাত নাড়া, ঘাড় বাঁকানো, মাথা কাত করার ভঙ্গি। রানার সামনে কোন দর্শক দাঁড়ালে, নড়াচড়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না ও। বার বার জায়গা বদলে শেষ পর্যন্ত টোটোর চেয়ে ওপরে এবং এক ধারের একটা জায়গায় চলে এল। টোটোর পিছন দিকটা মনে গেঁথে নেয়ার সুযোগ হলো তাতে। কাল থেকে লোকটার পিছু নেবে ও, ভাল করে চিনে নিচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে টোটোকে ফাঁকা জায়গা ধরে হেঁটে যেতে দেখল রানা। লম্বা পা ফেলে হাঁটে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গি। মাথাটা একদিকে একটু ফেরানো, একজন দেহরক্ষীর কথা শুনছে। ঠিক যেন একজন প্রেসিডেন্ট, বেরিয়ে যাচ্ছে কনফারেন্স রুম থেকে।

জিমনেশিয়াম থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে দিল রানা। কাল যদি এখানে না-ও আসে, আবদুল্লার কাছ থেকে তার হদিস জেনে নেওয়া যাবে। তারপর শুরু হবে অনুসরণ।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই লিয়েন মনতাজকে ফোন করে রানা বলল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্লাডস্টোনটা চাই আমি।' এক ঘণ্টা পর ফোন এল সোহেলের। 'সেফ হাউস,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

সুই সুক থ্রী অর্থাৎ সেফ হাউসে পৌঁছে সোহেলকে কেমন যেন উদ্বিগ্ন দেখল ও।

'তুই নাকি তেল আবিবে যাবি?'

'যাব শুনলে তুই ঘাবড়ে গিয়ে দেখা করতে ছুটে আসবি...'

'এত থাকতে তেল আবিবের কথা বললি কেন?' কেমন যেন সন্দেহের চোখে রানার দিকে তাকাল সোহেল।

'প্রথমে ওটাই এল মাথায়, তাই,' বলল রানা। 'কি ব্যাপার, তুই আমাকে জেরা করতে শুরু করে দিলি যে?'

'না...মানে...ও কিছু না।'

'শহরে কে এসেছে, জানিস?'

'হ্যাঁ, আবদুল্লার সাথে কথা হয়েছে আমার।'

'মেয়েটা কে?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'কোন্ মেয়েটা?'

'দীনা,' বলল রানা। 'ও কি আমাদের কেউ?'

'না।'

'তাহলে আমার কোডনেম জানল কিভাবে?'

'জানে বুঝি?'

'ওকে বলে দিবি, আমার কাছ থেকে যেন দূরে সরে থাকে। আমার কাগজ-পত্র চেক করেছে ও, তারপর পিছু নিয়ে আমার হোটেল পর্যন্ত এসেছে। কথা ছিল, আমাকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেয়া হবে। কিন্তু এসব কি?'

ভাবলেশহীন চেহারা সোহেলের।

'কিছু বলছিস না যে?' ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন করল রানা। 'এই মিশন

সম্পর্কে অনেক কথা গোপন করে যাচ্ছিস তুই। কেন?'

গম্ভীর হলো সোহেল। কিন্তু এবারও কোন কথা বলল না।

দ্রুত এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। 'এই যদি পরিস্থিতি হয়, আমার পক্ষে দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। মিশন সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব আমি জানতে চাই।'

থমথমে চেহারা নিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহেল। 'রানা, শান্ত হ। তুই ভুলে যাচ্ছিস, আমি তোর বস্।'

একটু বিমূঢ় দেখাল রানাকে। 'মানে?'

'আমি পদমর্যাদা বলে অফিশিয়ালি বলছি তোকে, এই মিশন সম্পর্কে যতটুকু বলা হবে তার চেয়ে বেশি জানতে চেষ্টা করবি না।'

সোহেলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। আরও কয়েক সেকেন্ড গুম হয়ে থাকার পর বলল ও, 'ঠিক আছে, জবাবদিহি পরেই নেয়া যাবে। তবে আমারও কিছু বলার আছে।'

'যেমন?' তেরছা চোখে তাকাল সোহেল।

'তুই বলেছিস, দূতাবাসে কনফারেন্স হবে। আমাকে সেখানে পাবি না। কারণ, কাজ আমি একা করতে চাই। তবে, ইনফরমেশন দরকার হবে আমার। প্রিন্সের অ্যারাইভাল শিডিউল, প্রোগ্রাম, সিটি ট্যুরের রুট ইত্যাদি। এগুলো তুই যোগান দিবি। হঠাৎ কোন বিপর্যয় না ঘটলে, একাই কাজ করব আমি।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করেও কি মনে করে আবার সেটা পকেটে ভরে রাখল সোহেল। 'আর কিছু?'

'না।'

'এবার বল, কিভাবে শুরু করবি?'

'টৌটা সম্পর্কে জানিস তুই। হং-কেঙ্গ রাইফেলম্যান হিসেবে তার জুড়ি মেলা ভার। জানামতে, তার লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয়নি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সোহেল। 'কিন্তু আবপুয়া আমাকে বলল, টৌটা কারাতে ফাইট দেখতে এসেছে। এই রকম প্রতি বছরই নাকি আসে সে।'

'কিন্তু আমরা ধরে নেব, অঘটন ঘটবার জন্যেই এবার এসেছে সে,' বলল রানা।

'সেটাই উচিত।'

'তুই আমাকে যা বলেছিস, আমি ঠিক তাই করতে যাচ্ছি। প্রিন্সকে কিভাবে খুন করতে চাইছে সে-সম্পর্কে তোকে একটা ধারণা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করব আমি। আমার প্রথম কাজ ব্যাংককে ওর ঘোরাফেরার প্যাটার্নটা ধরা। ভাগ্য ভাল হলে, ওর আয়োজন জানার জন্যে কোনও সূত্র পেয়ে যাব।'

'আমি ভেবেছিলাম,' সতর্কতার সাথে বলল সোহেল, 'হুমকিটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবি তুই—অন্য রাজধানীতে যে হুমকিটা দেয়া হয়েছে।'

'হুমকি দেয় সেন্টিমেন্টাল ফুলরা। টৌটা এর সাথে জড়িত বলে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে হুমকিটা দেয়া হয়েছে বলেই আজ আমরা এখানে।'

'কি লজ্জা!' ব্যঙ্গ করার সুযোগটা ছাড়ল না রানা।

শান্তভাবেই সেটা হজম করল সোহেল। বলল, 'সিকিউরিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পেয়েছি আমি, আরও পাব বলে আশা করছি। থাই সিক্রেট পুলিস তিনটে ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে। এক, টৌটা। দুই, ডন মুয়াং এয়ারপোর্ট। তিন, মোটামুটিভাবে টৌটার ওপর নজর রাখছে, তবে ওরা এখুনি ওকে খুব বড় একটা হুমকি বলে ভাবছে না।'

'কারণ?'

মুচকি একটু হাসি ফুটল সোহেলের ঠোঁটে। 'টৌটার সম্মান টৌটাকে ওরা ঠিকই দিচ্ছে। সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে ঢুকেছে সে, এই খবর পাবার সাথে সাথে সরকার প্রধান থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ আর যারা আছে প্রত্যেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কিন্তু এ-সবই রুটিন। কাজ না থাকলেও এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়ায় টৌটা। ওরা বলছে, লোকটা যদি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায় তাহলেই চিন্তার কথা, তা না হলে ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।'

'হুঁ।'

'টৌটা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হবে,' বলল সোহেল, 'কিন্তু সেটাও হবে রুটিন। অর্থাৎ তাকে খুঁজে বের করতে প্রচুর সময় লেগে যাবে, ইতিমধ্যে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। তাই বলছি, টৌটাকে তোর চোখের আড়াল করা চলবে না।'

'চকলেট খাওয়াও চলবে না, দাঁতে পোকা হবে,' বলল রানা। কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। 'বস্ যখন হয়েছিস, নির্দেশ দিবি। কিন্তু উপদেশ দিবি না।'

এমন ভাব করল সোহেল, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি। বলে চলল, 'পরিস্থিতি সম্পর্কে সারাক্ষণ সচেতন রাখা হয়েছে রাজা ভুমিবলকে। সম্মানীয় মেহমানের নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সিটি পুলিস আন্ডারগ্রাউন্ডে হানা দেয়ার জন্যে বিরাট আয়োজন করছে। ঘেরাও করে গ্রেফতার করার প্রথম ঢেউ উঠবে কাল কিংবা পরশু। ডন মুয়াং এয়ারপোর্টের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে, ফাঁকি দিয়ে একটা পিঁপড়েও গলতে পারবে না। পুলিসের সমস্ত ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে তলব করে রাজপ্রাসাদে পাঠানো হয়েছে, গোটা প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে ওরা। মোটর শোভাযাত্রা কোন পথ ধরে যাবে তা এখনও ঠিক হয়নি, তবে সম্ভাব্য রাস্তাগুলোর ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। প্রিন্সের নামে যে-সব চিঠিপত্র আর পার্সেল আসছে সেগুলো পরীক্ষা করার জন্যে ইনফ্রা-রেড-রে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রাসাদের কিচেন আর গ্যারেজে ডিউটি দিচ্ছে সিক্রেট পুলিস। রাজপ্রাসাদের যে অংশে মেহমান থাকবেন…'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলে সোহেলকে থামিয়ে দিল রানা। 'ওরা কি করছে না করছে আমার জানার দরকার নেই। ওরা পার্সেলের ভেতর বোমা খুঁজবে, কার্পেটের নিচে সাপ খুঁজবে, খাবারের সাথে বিষ আছে কিনা পরীক্ষা করবে। কিন্তু আমি জানি, ক্লাসিক একটা মেথড ব্যবহার করা হবে। এ আর কেউ নয়, টোটা। এমন একটা অস্ত্র ব্যবহার করবে সে, যেটাকে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। একটা লং শট।'

'আমি আশা করব গুলিটা কোত্থেকে হবে তা তুই আমাকে আগেভাগে জানাবি।'

'কিন্তু তার আগে আমি আশা করব, মোটর শোভাযাত্রার রুটটা তুই আমাকে জানাবি।'

'আমি জানলেই তুই জানবি।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল রানা, 'সেদিন বললি, সোহানা একটা মেসেজ পাঠিয়েছে—কই, দিলি না যে?'

মিটি মিটি হাসল সোহেল। বলল, 'কোন চিঠি বা লিখিত কিছু নয়, মৌখিক একটা সন্দেশ।'

সাগ্রহে সোহেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানার মনের অবস্থা টের পেয়ে হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে সোহেল বলল, 'আশা করছিস, সন্দেশটা তোর মুখে তুলে খাইয়ে দেব আমি, তাই না?'

'কি বলতে বলেছে বল!' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। 'তার আগে তোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাকে এক প্যাকেট স্টেট এক্সপ্রেস কিনে দিবি কিনা!' বলে আর দাঁড়াল না, কামরা থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল সে।

তিন

পরদিন দুপুরের একটু পর জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে এল টোটা। চলতি হপ্তায় সকাল আর বিকেলে ট্রেনিং-ফাইট রয়েছে, জানত রানা। টোটার জন্যে অপেক্ষা করছিল ও।

রেন্ট-এ-কার থেকে ফিফটিন হানড্রেড টয়োটা করোনা ভাড়া করেছে রানা। গাড়িটা ভাল, যানবাহনের ভিড়ের মধ্যেও চালাতে খুব সুবিধে। টোটার গাড়িকে অনেক দূর থেকে অনুসরণ করল ও, হাতে জুপিটার ফিল্ড গ্লাস থাকায় হারিয়ে ফেলার ভয় নেই।

এক দুই করে ছ'টা দিন কেটে গেল। এই ক'দিন নিজের গতিবিধি গোপন করার কোন চেষ্টাই করল না টোটা। তার এই আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। টোটা জানে, থাই সিক্রেট পুলিস মুহূর্তের জন্যেও তাকে চোখের আড়াল করছে না। ওদের পথ থেকে সরে থাকার জন্যে হিমশিম

খেতে হলো রানাকেও।

টোটার ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও হয়তো আধ ঘণ্টা থাকল, পরদিন সেই একই জায়গায় কাটিয়ে দিল দু'ঘণ্টার ওপর। কোথাও একদিন গেল সকালে, পরদিন গেল সন্ধের পর।

দেখার মত সব জায়গাতেই একবার করে গেল সে। মোটরবোট নিয়ে প্রায় পুরো একটা দিন চাও ফারায়া নদী আর বাজার এলাকার খালে কাটাল। ওয়াট ফারা কেউ-এ গেল এমারেল্ড বুদ্ধ-মূর্তি দেখতে। হাতে সময় নিয়ে শহর দেখছে সে, কোন তাড়া নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, মহা ফুর্তিতে আছে, উপভোগ করছে বেড়ানোটা। ওদিকে একশো গজ দূরে চোখে ফিল্ড গ্লাস তুলে গাড়িতে বসে গরমে সেদ্ধ হতে হয় রানাকে, একটা হাত থাকে স্টার্টার সুইচে, একটা পা থাকে ক্লাচে। গিয়ার দেয়াই থাকে। একটা চোখ রাখতে হয় রিয়ার ভিউ মিররে, হঠাৎ পার্কিং-স্ন্যাপ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। একদিন সকালে পুরো একঘণ্টা ধরে সাপ খেলা দেখল রানা। সবশেষে একটা গোখরার গলা টিপে বিষ বের করার রোমহর্ষক দৃশ্যটাও দেখতে হলো।

লাভের মধ্যে এটুকু হলো যে রানা বুঝল, টোটার এই আচরণ তার চরিত্রের সাথে মিলছে না। নির্ভেজাল একজন ট্যুরিস্টের মত চলাফেরা করছে সে, অথচ আসলে সে ট্যুরিস্ট নয়। রানা জানে, এর আগেও ব্যাংককে অনেকবার এসেছে টোটা।

এই ছ'দিন মাত্র একটা অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটল। সনম চাই রোডে, রাজপ্রাসাদের বাইরে, তার হিনো কন্টেসা থারটিন হানড্রেড দাঁড় করিয়েছিল টোটা। কোন কারণ ছাড়াই বেশ কয়েক মিনিট গাড়িটা ছিল ওখানে। কন্টেসার পিছু নেয়া অপর গাড়িটা থেকে স্যুটপরা চারজন লোক নেমে আসে, জানালা দিয়ে কথা বলে টোটার সাথে। তাদের নির্দেশ বা অনুরোধে কন্টেসা থেকে বেরিয়ে আসে টোটা। তাকে নিয়ে নিজেদের গাড়িতে ফিরে আসে লোকগুলো, সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দেয় ড্রাইভার। আবার টোটা পিছু নেয়ার আগে ফারা রাচাওয়াং পুলিস স্টেশনের বাইরে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় রানাকে। পরদিন সোহেলের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া গেল। টোটাকে তারা জেরা করেছে, সার্চ করেছে, কেড়ে নিয়েছে তার ক্যামেরার ফিল্ম।

সিক্রেট পুলিস এই কাজটা কেন করল, রানার মাথায় ঢোকেনি। নিশ্চয়ই নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করার জন্যে নয়। যে কেউ বুঝবে, তাকে যে চোখে-চোখে রাখা হয়েছে, টোটা তা জানে। গ্রেফতার করার বা দেশ থেকে বের করে দেয়ার অজুহাত তৈরির জন্যে জেরা করা হয়েছে এ-ও মেনে নেয়া যায় না। বিনা অজুহাতেই এসব করতে পারে ওরা। রানা ভাবল, তার ও সিক্রেট পুলিসের উদ্দেশ্য প্রায় একই ধরনের। পুলিসও চাইছে, টোটা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াক, কিন্তু তাদের চোখের আড়ালে যেন যেতে না পারে। এই অবস্থায় টোটা যদি খুনের প্ল্যান করে, তারা সেটাকে বানচাল করে দেবে উনসাট মিনিটে, যাতে টোটা পালিয়ে যেতে না পারে। বা বিকল্প

কোন প্ল্যান সেট করতে না পারে।

হতে পারে, প্রায়-অন্ধকার গাড়ির ভেতর টোটা অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল পুলিস। রাজপ্রাসাদের খোলা জানালাগুলো রেঞ্জের মধ্যেই ছিল, সেটাই হয়তো তাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবু টোটার ব্যাপারে এই ভুল তাদের করা উচিত হয়নি। এ বারবনিতার বা খেমরান নয়, যারা খুন করার উদ্দেশ্য থাকলে কখনোই প্রকাশ্যে সীমান্ত পেরিয়ে কোন দেশে ঢোকে না। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে, সে-দেশে তাদেরকে একবারের জন্যেও কেউ দেখেনি। খুনের ভঙ্গি আর ধরন দেখে বোঝা যায়, কাজটা কার। কিন্তু টোটার চরিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। তার প্রতিটি কাজে একটা স্টাইল আছে। কোন দেশে ঢুকতে হলে বুক ফুলিয়ে ঢোকে সে, সাথে বৈধ পাসপোর্ট থাকে। নিজের উপস্থিতি গোপন করার কোন চেষ্টাই নেয় না। কে জানে, লোকটা বোধহয় আতঙ্ক ছড়াতে ভালবাসে। কিংবা ইন্টেলিজেন্স, সিক্রেট পুলিস, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চকে চ্যালেঞ্জ করে মজা পায়। তার জানা আছে, কোন দেশে তার উপস্থিতি ঘটলে সবাই ধরে নেয় প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যদিও দশবারের মধ্যে নয়বারই টোটা বিদেশের মাটিতে পা দেয় সময়টা উপভোগ করার জন্যে—হয় অলিম্পিক না হয় ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ কোন ফাইট দেখতে।

টোটাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার ঝুঁকি থাই সিক্রেট পুলিস নিতে পারে না, সত্যি তারা যদি সিরিয়াস হয়। তাতে চোখের আড়াল করা হবে টোটাকে। এবং উনত্রিশ তারিখে এ-দেশে টোটার যদি কোন কাজ থাকে, যে-কোন একটা সীমান্ত পেরিয়ে আবার ঢুকবে সে, এবং ঢুকেই চলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ডে। টোটা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে, প্রিন্সের ওপর হামলা হবেই। সোহেলের সাথে যোগাযোগ করে ব্যাপারটা কি জানার চেষ্টা করবে নাকি? পুলিস কি সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে কাজটা করেছে, নাকি হঠাৎ করে তারা তাদের ট্যাকটিক্স বদলেছে? চিন্তাটা বাতিল করে দিল রানা। অফিশিয়ালি বাংলাদেশী এজেন্টদের অস্তিত্ব থাই সরকার স্বীকার করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সোহেল হয়তো কোন তথ্য আদায় করতেই পারবে না।

ছয় দিনের দিন একটা দৈনিক পত্রিকা পড়ার সময় পেল রানা। এক্কুণ নম্বর সুকুমভিত সুই, টার্কিস বাথে ঢুকেছিল টোটা।

ব্যাংকক আন্ডারগ্রাউন্ডে গ্রেফতারের দ্বিতীয় ঢেউটা সম্পর্কে রিপোর্ট বেরিয়েছে। সন্দেহজনক চরিত্র—এই অজুহাতে পাঁচশো লোককে গ্রেফতার করেছে ব্যাংকক মেট্রোপলিটান পুলিস কমান্ড, চোরাই মালামাল উদ্ধার করেছে পাঁচ লাখ বাথের। এই অপারেশনের নাম দেয়া হয়েছে, অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। কাগজে আরেকটা খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার। চলতি মাসের উনত্রিশ তারিখে যে মোটর শোভাযাত্রা হবে, সেটার রুট নির্বাচনে কর্মকর্তাদের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে এখনও। এই প্রথম জানানো হলো, প্রিন্স যেদিন পৌঁছুবেন সেদিনই অনুষ্ঠিত হবে এই শোভাযাত্রা।

সোহেল জানিয়েছে, যে রুটই নির্বাচন করা হোক, মাত্র দু'একদিন থাকতে প্রকাশ করা হবে সেটা, কেউ যেন কোন রকম প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ না পায়।

হুমকি সম্পর্কে কাগজে কিছু লেখা হয়নি। দিন দশেক আগে ছোট একটা খবরে বলা হয়েছিল, সন্ডনী হোম অফিসে একটা চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, থাইল্যান্ডে গেলে প্রিন্স ফরহানকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। এই খবরের ওপর সরকার বা আর কারও কোন মন্তব্য ছিল না। তারপর থেকে রিপোর্টাররা একদম চুপ মেরে গেছে।

এই ছ'দিনে কোথায় কোথায় গেছে টোটা তার একটা তালিকা তৈরি করেছে রানা, সেটার ওপর চোখ বুলাল ও। উদ্দেশ্য, কোন তাৎপর্য ধরা দেয় কিনা। ওয়াট ফারা কেউ-এ গেছে পাঁচবার, এই রাস্তায় সরকারী মন্দির বা ভজনালয় রয়েছে। নারুপিনি পোলো গ্রাউন্ডে গেছে তিনবার। তিনবার গেছে পাস্তুর স্নেক-ফার্মে। মোটরবোট নিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে গেছে দু'বার। লিঙ্ক রোডের কার-পার্কে আধ ঘণ্টার জন্যে থেমেছিল একবার। লিঙ্ক রোডের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেছে রামা ফোর। শুধু সরকারী মন্দির আর নারুপিনি কিছুটা তাৎপর্য বহন করে। সরকারী মন্দির রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি, আর ত্রিশ তারিখে পোলো খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মাত্র একবার ঢুঁ দিয়েছে এইরকম জায়গাগুলোর মধ্যে একটি হলো গভর্নমেন্ট হাউস, ওখানেই যে মোটর শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটবে সেটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে। জেমস থম্পসন থাই এগজিবিশনেও একবার গেছে, ধরে নেয়া যায় ওখানেও প্রিন্স একবার যাত্রা বিরতি করবেন। এছাড়া ফারা চুলা চেদিতে গেছে, ওখানে রয়েছে একটা মন্দির, যেখান থেকে রামা ফোরের কাছে লিঙ্ক রোড দেখতে পাওয়া যায়।

এই মন্দির আর নতুন রোড, দুটোর মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। লিঙ্ক রোডে গিয়েছিল টোটা, কোন কারণ ছাড়াই অনেকক্ষণ ছিল সেখানে, আবার মন্দির থেকে রোডটা দেখতে পাওয়া যায়।

সিক্রেট পুলিসগুলোকে ঈর্ষা করতে শুরু করছে রানা। ওরা বদলি ডিউটি দিচ্ছে, আর রানাকে চব্বিশ ঘণ্টা একা খাটতে হচ্ছে গাধার খাটনি। গত ছ'দিনে ভাল কোন খাবার জোটেনি কপালে। স্যান্ডউইচ আর বিস্কুটই ছিল একমাত্র ভরসা। শেষ কবে ঘুমিয়েছে, মনে করতে পারে না। গাড়িতে বসে নিজের অজান্তে বহুবার তন্দ্রার কোলে ঢলে পড়েছে ও, তাকে ঠিক ঘুম বলে না। টোটার ওপর নজর রাখার কাজটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছে পুলিসের জন্যে। ওদের পথ থেকে সরে থাকাটাও একটা ডাকনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোহেল বলেছে থাই সিক্রেট পুলিসের ডাইরেক্টর জেনারেল রানার উপস্থিতির কথা জানেন, বলেছেন, পুলিসের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ালে ওকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়া হবে।

মাত্র একজন এজেন্টের ডিরেক্টর হিসেবে সোহেল কতটা ক্ষমতা রাখে, রানার কোন ধারণা নেই। তবে তাকে যদি কোণঠাসা করা হয়, নিজের

ক্ষমতা দেখাতে কসুর করবে না সে। বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে থাই সরকারকে অনুরোধ করাতে পারে। কিন্তু এসব করতে গেলে প্রচুর সময় থাকা চাই, যা নেই।

প্রিন্সকে খুন করার একটা প্ল্যান চেয়েছিল সোহেল। টোটাকে তিন দিন অনুসরণ করার পর একটা নয়, দুটো বিকল্প প্ল্যান হস্তান্তর করেছে রানা। দুটোই দূর থেকে গুলি করার প্ল্যান। এমন দুটো রাস্তা বেছে নিয়েছে রানা, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় শোভাযাত্রা এই রাস্তাগুলো দিয়ে যাবে। বাংলাদেশ দূতাবাস, লামপিনি গ্রাউন্ড আর রাজপ্রাসাদ যে ত্রিভুজটা তৈরি করেছে তার আশপাশে এগুলো প্রধান সড়ক। একটা প্ল্যানের মধ্যে ফারা চুলা চেদি মন্দির আর লিঙ্ক রোডও রয়েছে।

ছ'দিনের দিন সন্ধ্যায় টোটা আর তার দু'জন দেহরক্ষী ইন্দোচীনা এলাকায় রোজি বারে ঢুকল, তখন সাতটা বাজে। সুযোগ পেয়ে পা দুটো লম্বা করে দিল রানা। গাড়ি থেকে একবার নেমে দেখল, বারের ভেতর দুই কোণে দু'জন সিক্রেট পুলিস পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এই সময় রোজই কোন না কোন বারে ঢুকে গলা ভেজায় টোটা। ত্রিশ মিনিট পর বেরিয়ে এসে ডিনার খেতে অন্য কোথাও যায়।

সোয়া সাতটায় গাড়িতে ফিরে এল রানা। সাড়ে সাতটা বাজল। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। চোখ পড়ে রয়েছে বারের দিকে। তারপর সাতটা চল্লিশ বাজল। সাতটা পঁয়তাল্লিশে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। আটটায় নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

রাস্তা পেরিয়ে বারে ঢুকল রানা। টোটাকে দেখল না কোথাও। যা ভয় করেছিল তাই, গা ঢাকা দিয়েছে সে।

মাঝরাত পর্যন্ত শহর চষে বেড়াল রানা। রোজি বার থেকে রেসিডেন্স ফ্লোরেল, ওখানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে টোটার। ফেরেনি। তারপর প্লাজার থাই রুমে, যেখানে প্রায় রোজই পিকিং ডাক খায় টোটা। পৌঁছায়নি। তারপর ডিক'স ইয়েস-এ। তারপর রাজপ্রসং-এর সাংগ্রিলায়। সেখান থেকে জুয়া খেলার আড্ডাগুলোয়। কোথাও নেই। কল গার্লদের দুটো আস্তানায় গেল রানা। টোটাকে আজ কেউ দেখেনি। ফারা চাও-এর আফিম ঘরে এল রানা। নেই। এমারেল্ড গেটের কাছে স্ট্রিপটিজ হল, সেখানেও নেই টোটা।

ক্লান্ত হয়ে সেফ হাউসে ফিরল রানা। আগেই খবর দিয়েছিল, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সোহেল। দুঃসংবাদটা শান্ত ভাবেই গ্রহণ করল সে। কিন্তু চেহারা কালো হয়ে আছে।

'পুলিসও তাকে হারিয়ে ফেলেছে,' বলল সোহেল। থমথমে চেহারা নিয়ে বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তারপর আবার বলল, 'আমি জানতাম, এটা একটা কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে।'

'এখন কি করবে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তেমন কিছু করবে না। টোটাই ওদের একমাত্র

লক্ষ্য নয়। এখানকার আন্ডারগ্রাউন্ডে কিছু লোক আছে যারা বিদেশীদের কাছ থেকে টাকা পায়...'

'যেমন?'

'যেমন ধর, মার্কিন ইহুদিরা এখানকার সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোকে মালপানি দেয়। অনেক সময় ইসরায়েল তার স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে এইসব মার্কিন ইহুদিদের মাধ্যমে এখানকার গ্রুপগুলোকে কাজে লাগায়। থাই সিক্রেট পুলিসের ধারণা, প্রিন্সের আসল বিপদ ওদের তরফ থেকেই। ওরা আন্দাজ করছে, এই গ্রুপের কেউ একজন দল থেকে ছুটে গিয়ে সউদী আরবের হোম অফিসে চিঠিটা পাঠিয়েছে। ওরা তাই গ্রুপটাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।'

'তার মানে কি টোটার ব্যাপারে ওরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে?'

'তা থাকবে না,' বলল সোহেল। 'সার্চ করবে, কিন্তু সেটা হবে রুটিন সার্চ।'

'এভাবে তাকে ওরা খুঁজে পাবে না।'

'কিভাবে পাবে তাহলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহেল।

'টোটার পথ থেকে সম্পূর্ণ সরে থাকতে হবে ওদেরকে,' বলল রানা। 'তাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা বাদ দিলে, একসময় না একসময় টোটা বা তার সেলের কেউ চেহারা দেখাবে।'

'তোর কথা আমি ঠিক...'

'টোটার গোটা সেলটাকে চিনি আমি,' বলল রানা। 'দু'জন দেহরক্ষী, চারজন অপারেটিভ। ছ'দিন ধরে আমি খুব সাবধানে ছিলাম, ওরা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি। কিন্তু আজ সন্ধের পর শহর চষে বেড়িয়েছি, সাবধান হবার কোন উপায় ছিল না। আমাকে যদি ওরা চিনে না থাকে, এখনও আমার একটা চান্স আছে। টোটাকে দেখলে চিনতে পারব আমি। তার সেলের কাউকে দেখলেও চিনতে পারব। আমার জন্যে এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু পুলিস যদি ওদেরকে খুঁজে বেড়ায়, আড়াল থেকে ওরা মুখই বের করবে না।'

'বলছিস, সময়ের ব্যাপার। হাতে রয়েছে আর মাত্র তেরো দিন।' পায়চারি শুরু করল সোহেল। কপালে ঘাম। 'বিপদের গুরুত্ব তোকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই...'

সোহেলের বো টাই বাঁকা হয়ে রয়েছে। রানা বুঝল, দুশ্চিন্তায় পাগল হবার জোগাড় হয়েছে তার। বলল, 'না, নেই। টোটা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে, তার মানে হামলা হবেই। প্রিন্সের জীবন সত্যি বিপন্ন। কিন্তু এ-ও জানি, টোটাকে আমি খুঁজে পাব।' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল ও, 'দূতাবাসে ওরা কি করছে, বলবি? নাকি প্রশ্ন করাটা বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে?'

'দূতাবাসে ওরা মানে?'

'রুম সিক্স্টিতে তোরা যারা আছিস।'

'রুম সিক্স্টিতে আমার আসা-যাওয়া আছে বটে,' বলল সোহেল, 'কিন্তু ওদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যতটুকু জানি, ওরা সবাই খুব ব্যস্ত।

সময় পেলে অ্যামব্যাসাডর নিজেও চেয়ারে বসছেন। তোর কাজ সম্পর্কে আমার কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছে ওরা...' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'তোর ইমিডিয়েট প্ল্যান কি?'

'ঘুম,' বলল রানা। 'একটানা বারো ঘণ্টা। কেউ যদি বিরক্ত করে, জানি না তার কপালে কি আছে।'

পরদিন বিকেলে ঘুম থেকে জাগল রানা। নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পুরো একটা ঘণ্টা ব্যয় করল। কফি নিয়ে বসে ইচ্ছে করেই মাথাটাকে খালি করে রাখল, কোন বিষয়েই ভাবল না কিছু।

কফি শেষ করে বেরিয়ে পড়ল ও। টৌটোকে খুঁজে বের করবে।

দেশে একজন মেহমান আসছেন, নানা আয়োজন দেখে সেটা বেশ বোঝা যায়। খানিক দূর পর পর বিশাল আকারের তোরণ নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তার ধারের স্টুডিওগুলো তাদের শো-কেসে প্রিন্সের রঙিন ছবির প্রদর্শনী শুরু করেছে, বিক্রি কম হলেও ভিড় করার লোকের অভাব নেই। শহরের ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে শুরু করে দিয়েছে অঙ্গসজ্জার প্রতিযোগিতা। দিন যত এগিয়ে আসছে, উৎসব-মুখর হয়ে উঠছে ব্যাংকক।

হাসি-খুশির রাজ্যে রানা যেন একটা খাপ্পা, উদ্‌ভ্রান্তের মত খুঁজে ফিরছে পরশ পাথর। টয়োটা ওকে নিয়ে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর নিজেরই তৈরি গোলক ধাঁধার ভেতর। আশা, টৌটো বা তার দলের কারও সাথে দেখা হবে।

সোহেল চেয়েছিল রোজ একবার করে তার সাথে দেখা করবে রানা, কিন্তু রিপোর্ট করার কিছু নেই বলে তাকে এড়িয়ে চলল ও। কিন্তু ছয় দিনের দিন হোটেলের লবিতে ওর পথরোধ করে দাঁড়াল সে।

'পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?' রাগের সাথে জানতে চাইল সোহেল। 'বলে দে, কাজটা তোর দ্বারা সম্ভব নয়। আমি তাহলে প্রিন্সের সফর বাতিল করার ব্যবস্থা করতে পারি।'

ঘুমে বুজে আসছে রানার চোখ। মনে হলো, টলে পড়ে যাবে।

'আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি,' আবার বলল সোহেল। 'পুলিস-কর্নেল রামনাপাকে বিপদটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার কথায় কান দেয়নি সে। টৌটোকে ওরা তেমন কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না। ওদের ধারণা, আসল ভয় সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোকে। তাদের প্রায় সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কাজেই প্রিন্স বিপদ-মুক্ত বলে মনে করছে ওরা। এরই মধ্যে ঝেঁটিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কৃতিত্ব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করতে শুরু করেছে অফিসাররা। এদিকে গুজব ছড়িয়েছে, থাইল্যান্ড ছেড়ে চলে গেছে টৌটো।'

'স্বাভাবিক,' বলল রানা। 'টৌটো নিজেই রটাচ্ছে।'

'আমি জানতে চাই, তোর প্ল্যান কতদূর?'

'আগেই তো বলেছি, সময়ের ব্যাপার। পুলিস যদি খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে থাকে, ভালই হয়েছে—খোলা মাঠে একা কাজ করতে পারব আমি।'

'কিন্তু সময়ের হিসেব করেছিস? শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করা সম্ভব

হবে না, সেটা কূটনীতির রীতি বিরুদ্ধ। অন্তত দু'দিন আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তার মানে পাঁচ দিন নয়, আসলে সময় পাচ্ছিস মাত্র তিনদিন।'

'ঠিক আছে, তিনদিন।'

'আমি চাই, রোজ তুই আমাকে রিপোর্ট করবি।'

'করব।' পকেট থেকে এক প্যাকেট স্টেট এক্সপ্রেস বের করল রানা। সোহেলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'কি বলেছে সোহানা?'

প্যাকেটটা লুফে নিল সোহেল। উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর মুখে তুলে বলল, 'বলেছে, লীনা মেয়েটা তোমার সাংঘাতিক ভক্ত। ওর আসল চেহারা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। কাজেই সাবধান!'

'মানে?'

'সোহানার সাথে দেখা হলে মানেটা তাকেই জিজ্ঞেস করিস,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সোহেল। তার ঠোঁটের কোণে মুহূর্তের জন্যে ফুটে ওঠা মুচকি হাসিটা দেখতে পেল না রানা।

পরদিন টৌটো বা তার দলের কাউকে খুঁজে পেল না রানা। ব্যাংককের যে-সব জায়গায় একবার হলেও গেছে টৌটো, তার কোনটায় ঢুঁ মারতে বাদ দিল না, কিন্তু বার বার ফিরে এল মন্দির আর লিঙ্ক রোডে। কেন যেন ওর মন বার বার ওদিকেই শুধু টানল ওকে।

এবার নিয়ে তিন বার বিশাল বিস্তৃত ধান খেতের মাঝখান দিয়ে এয়ারপোর্ট এলাকায় চলে এল ও। কাছেপিঠের সবগুলো বিল্ডিং খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। এগুলোর যে-কোন একটা থেকে প্রিন্সকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে টৌটো। দশ বারোটা বিল্ডিং থেকে নব্বই ডিগ্রীর চেয়ে কম অ্যাঙ্গেলে গুলি করা সম্ভব, তার মধ্যে দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার একটা করে বাঁকের মাথায়, এর যে-কোন একটায় পজিশন নিয়ে থাকলে প্রিন্সের গাড়িটাকে নাক বরাবর এগিয়ে আসতে দেখবে টৌটো।

ডন মুয়াং এয়ারপোর্ট ঝকমক তকতক করছে। ভেতরে ও বাইরে তৈরি করা হচ্ছে তোরণ, কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে গেট আর রানওয়ের কিনারা। চারদিকে ভাল লাগার মত দৃশ্য। রানা ভাবল, সে কি আসবে? যদি আসে, বাঁচবে?

নীল রঙের পুরানো মরিস পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসছিল। দেখতে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। ওর হাতের স্টিয়ারিং হুইল হঠাৎ খুন বন বন ঘুরতে শুরু করল। সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে উল্টোদিকে এগোল টয়োটা। মরিসের সামনে থামল সেটা।

গাড়ি থেকে নামল রানা। এক ঝটকায় দরজা খুলে উঠে পড়ল মেয়েটার পাশে। বলল, 'পনেরো দিন ধরে আমার পেছনে লেগে আছ। কারণটা জানতে চাই আমি। নাও, শুরু করো।'

'কারণ হয়তো একটা আছে,' উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে

থেকে বলল মেয়েটা, 'কিন্তু সেটা আপনাকে আমি বলতে পারি না।'
সন্ধ্যা নাগছে, হঠাৎ করে সব আলো জ্বলে উঠে ঝলমলে করে তুলল এয়ারপোর্টটাকে।
'নাম?'
'দীনা।'
'বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই ছদ্মনাম?'
যেমন সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনি তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, কথা বলল না।
'ওরা কারা? তালপাতার সেপাই, আর ঢাউস বেলুন?'
ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল দীনা। তার মুখের কুৎসিত জন্মদাগটাকে প্রকাণ্ড একটা জ্যান্ত শুঁয়োপোকা বলে মনে হলো রানার। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল না ও, কিন্তু চেহারা হয়ে উঠল কঠিন।
'কারা ওরা?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা। দেখল, দীনার গলার একটা রূগ ঘন ঘন লাফাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন, চওড়া চোখে কোন ভাব নেই, দৃষ্টিতে শুধু সতর্কতা।
'তারা এখন কোথায়? তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক কি? আমার পিছু নিয়ে এখানে এসেছ কেন?'
মেয়েটার ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক হলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। তারপর বলল, 'ভাবলাম আপনি বোধহয় প্লেনে চড়বেন।'
মিষ্টি গলা। মনে মনে এইটুকু প্রশংসা করতেই হলো রানাকে। শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্যে এর চেয়ে ভাল ওষুধ বোধহয় হতে পারে না। 'আমি প্লেনে চড়লে তোমার কি? কি করতে তুমি?'
'কি করতাম সেটা নির্ভর করত আপনি কোথায় যাবার জন্যে প্লেনে উঠতেন তার ওপর।'
সোহেলের ওপর খেপে উঠল রানা। সামান্য একটা মেয়েকে তার পেছন থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না! চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবার পর থেকে সে কি ঘাস খেতে ধরেছে? 'কথার প্যাঁচ কষে কোন লাভ নেই,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'যা জিজ্ঞেস করব, সত্যি উত্তরটা দেবে। প্লেনে চড়ে কোথায় যাব বলে মনে করেছিলে তুমি?'
'তেল আবিবে।'
'যদি যেতাম কি করতে?'
'বাধা দিতাম।'
'কিভাবে?'
'আপনাকে সাবধান করে দিয়ে।'
'কি বলে?'
'বিপদটা কি, ব্যাখ্যা করে বলতাম।'
'মাঝরাতের ফ্লাইট ধরে ওখানেই যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'করো বাধা।'

দীনা এই প্রথম হাসল। সেদিনের মত আজও পরিষ্কার জলতরঙ্গের আওয়াজ শুনল রানা। হাসিটা শুরু হলো চোখ থেকে, তারপর স্পর্শ করল মুখ। 'না, আপনি যাচ্ছেন না।'
জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। পার্কিং লটে এইমাত্র একটা গাড়ি এসে থামল। আরোহীরা নামছে, সেদিকে খেয়াল রাখল ও।
'একাই এসেছি আমি,' বলল দীনা। 'কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলার সময় পাইনি।'
দীনার দিকে ফিরল রানা। 'তোমরা আসলে কি? সিকিউরিটি? স্পেশাল ব্রাঞ্চ? নিজেদের চরকায় তেল না দিয়ে আমার পেছনে লেগে থাকার মানে কি?'
'কর্তার হুকুম।'
'পরিচয়?'
খিলখিল করে হেসে উঠল দীনা। 'বলব না। তাঁর পরিচয় জানলে আপনাকে এমন বোকা দেখাবে না, যে কি বলব!'
শান্ত থাকল রানা। বলল, 'তোমরা জানো, টোটাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তাকে আমি খুঁজে পাব। যখন পাব, তোমরা কেউ সেখানে থাকবে না। বাই গড, আই শ্যাল মেক শিওর অভ দ্যাট। ওদেরকেও জানিয়ে দিয়ো, ভাল চায় তো আমার রাস্তা থেকে যেন দূরে সরে থাকে।' দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল রানা।
'একটা অনুরোধ,' রানার চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল দীনা। 'আপনি যদি সত্যি তেল আবিবে যেতে চান, আমার সাথে আগে দেখা করবেন, প্লীজ! দূতাবাসে খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।'
'আমাকে তুমি আর দেখবে না,' বলল রানা। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মরিস থেকে।

পরদিন দুপুরের দিকে হোটেলের খাতা থেকে নাম কাটাল রানা। দু'হাতে দুটো সুটকেস নিয়ে গাড়িতে উঠল ও। তালপাতার সেপাই, ঢাউস বেলুন আর শুঁয়োপোকা, এদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এই মিশন সম্পর্কে তো বটেই, ওদের পরিচয় ও কাজকর্ম সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলছে সোহেল। ঠিক যে মিথ্যে কথা বলছে তা-ও নয়, তথ্য চেপে রাখছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, রানা ওদেরকে পেছনে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার ঝুঁকি নিতে পারে না। শুধু ওদের উপস্থিতির কারণেই টোটাকে পেয়েও হারাতে হতে পারে।
যানবাহনের ভিড়ের মধ্যে পনেরো মিনিট ঘুরে বেড়াল রানা। সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে অনেকগুলো কৌশল ব্যবহার করল ও। তারপর প্যান-আম অফিসের কাছাকাছি একটা হোটেলে নাম লেখাল। দু'বছর আগে এই হোটেলে উঠেছিল, ম্যানেজার চিনতে পারল ওকে।
এরপর মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করল রানা, কোন ফলাফল ছাড়াই।
পরদিন অনেকভাবে চেষ্টা করে উত্তম আবদুল্লার দেখা পাবার একটা

anmsohel@yahoo.com www.murchona.com

ব্যবস্থা হলো। তার কাছে টোটার কোন খবর থাকলে চেষ্টাটা সার্থক হয়েছে
বলে মনে হবে। চাও ফায়ারার একটা ডক ইয়ার্ডে জাহাজ থেকে কার্গো
খালাস তদারক করছিল সে। যতক্ষণ না তার ওভারশিয়ারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে
দিল, এক ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হলো রানাকে।

'চলুন অফিসে গিয়ে বসি। চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

'চা খাবার সময় নেই,' বলল রানা।

আজ স্যুট পরেছে উত্তম আবদুল্লা। শখ করেই হাতে নিয়েছে একটা
ওয়াকিং স্টিক। কাঁচা পাকা ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির সাথে চমৎকার মানিয়েছে
কালো ফ্রেমের চশমাটা। বলল, 'আমি জানি, আপনার হাতে সময় খুবই কম।
আপনার আরও সাহায্যে লাগতে পারলে খুশি হতাম। আমার মন বলছিল,
"আপনি আমার সাথে দেখা করতে আসবেন।

'তাহলে কেন আমি এসেছি তাও আপনি জানেন,' বলল রানা।

'জানি। কিন্তু দুঃখিত। সে কোথায়, আমি জানি না। তবে, বিপদ ঘটার
আগে তার সন্ধান আপনাকে আমি পাইয়ে দিতে চাই।' এক সেকেন্ড চুপ
করে থাকল সে। চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটল, তারপর ফুটল একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
ভাব। 'তাতে করে, আমার আর আমার বন্ধুদের বেশ খানিকটা ঝুঁকি নিতে
হবে—বলা যায় না, আমরা যে জড়িত সেটা হয়তো ফাঁস হয়ে যাবে, তবু
কাজটা আমরা করে দিতে চাই।'

কেন যেন মনে হলো রানার, তথ্যের বিনিময়ে ভাল একটা দাম পাবার
জন্যে এত কথা বলছে। 'প্রস্তাব করুন,' বলল ও। 'কত বাধ হলে টোটার
খবর পাব আমি?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন,' আহত দেখাল আবদুল্লাকে। 'আমি
টাকার লোভে আপনাদের সাথে সহযোগিতা করছি না। বলতে পারেন, ঋণ
শোধ করছি। এর আগে যে টাকা নিয়েছি, লোকজনকে দিতে হয়েছে, নিজের
জন্যে রাখিনি।'

'মানে?'

মুচকি হাসল উত্তম আবদুল্লা। 'আপনি হয়তো জানেন না, আমি আসলে
দু'মুখো সাপ। একই তথ্য অনেক লোককে বিক্রি করি। কিন্তু আপনাদের
বেলায় তা করছি না।'

'আপনার এই মহানুভবতার কারণ?' একটু ব্যঙ্গই করল রানা।

'কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে নাপিত ছিলাম
আমি,' বলল উত্তম আবদুল্লা। 'এখন যিনি মেজর জেমাক্লেন এবং অবসর
নিয়েছেন, তখন তিনি ছিলেন মেজর রাহাত খান—আমি তাঁর চুল দাড়ি
কাটতাম। মানুষ তো নন, দেবতা। তাঁর সান্নিধ্যে যে-ই এসেছে, সে-ই
মানুষ হয়ে গেছে। আমি বাদে।...সে যাই হোক, কিন্তু ঋণ আছে আমার তাঁর
কাছে। শোধ করার এই সুযোগ যখন পেয়েছি, ছাড়ব কেন?'

দু'মিনিট পর চলে এল রানা। ঠিক হলো, হঠাৎ দরকার পড়লে
সোহেলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করবে ও।

*

এমন কড়া রোদ, শহরে যেন আগুন ধরে গেছে। টয়োটার ভেতরটা মনে হলো
গনগনে তন্দুর। গাড়ি পার্ক করার জন্যে সব সময় ছায়াও পেল না রানা।
সেদিন কোন বিরতি ছাড়াই প্রায় উনিশ ঘণ্টা কাজ করল ও। ফলাফল শূন্য।

পরদিন সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে কাজে নামল রানা। তিন ঘণ্টা
পর পাগলের মত খোঁজ করতে লাগল সোহেলের। হোটেল, দূতাবাস ও সেফ
হাউস, তিন জায়গায় টেলিফোন করল ও। কোথাও পাওয়া গেল না। কাজেই
সেফ হাউসে রুটিন সাক্ষাৎকারের জন্যে বেলা বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে
হলো।

যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে এই রকম একটা বোমা বলে মনে হলো
সোহেলের চেহারা। রানার কাছ থেকে এমনকি রিপোর্ট পর্যন্ত চাইল না সে।
বলল, 'দু'ঘণ্টা আগে রুম সিক্সে আমরা একটা ইমার্জেন্সী মীটিঙে বসেছিলাম।
প্রিন্স সবচেয়ে বেশি ভরসা করছেন তোর ওপর। সিদ্ধান্ত হয়েছে, তুই যে ব্যর্থ
হয়েছিস সেটা তাঁকে জানানো হবে। কারণ, সফর বাতিল করতে হলে এটাই
শেষ সময়...'

'তাকে আমি পেয়েছি,' বলল রানা।

সকালটা ছিল রানার অনুকূলে। এক ঘণ্টাও হয়নি, টোটার ট্রাভেল-প্যাটার্ন
ধরে এগোচ্ছে টয়োটা, নিউ রোডের একটা গান স্মিথের দোকান থেকে
সেলের একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

রানা জানত, এটা ঘটবেই। দিনের পর দিন রোজ বারো ঘণ্টা করে
খোঁজাখুঁজি করলে, লোকটা যদি শহরে থাকে, তার দেখা পাওয়া যাবেই। এ-
ও জানত, টোটা বা তার সেলের কাউকে বেরুতেই হবে বাইরে, কারণ
হাতে ওদের অনেক কাজ।

রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, বন্দুকের দোকান থেকে
বেরিয়ে এসে সেটায় চড়ল দলের লোকটা। ট্যাক্সির পিছনে জোঁকের মত
লেগে থাকল টয়োটা। সব দিক থেকে সাবধান থাকল রানা, লোকটা ওর
উপস্থিতি যাতে কোন রকমেই টের না পায়। নদীর কাছাকাছি একটা
অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে থামল ট্যাক্সি। আড়ালে গাড়ি রেখে আধ ঘণ্টা
অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর দেখল দু'জন দেহরক্ষীসহ ট্যাক্সিতে
উঠল টোটা।

ট্যাক্সিতে প্রথমে চড়ল টোটা। দু'জন লোক ধরাধরি করে অত্যন্ত যত্নের
সাথে একটা গোল্ড কুথ নিয়ে এল, ট্যাক্সিতে বসা টোটার হাতে তুলে দিল
সেটা। তারপর নিজেরাও উঠে বসল।

পিছু না নিয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেয়ার ঝোঁকটা অদম্য হয়ে উঠল
একবার। তাহলে ওর উপস্থিতি কিছুতেই আঁচ করতে পারবে না ওরা। শর্ট-
কাট পথ ধরে বোটানিকাল মিউজিয়ামে ওদের আগেই পৌঁছে যেতে পারবে
ও। কিন্তু ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর। ওরা হয়তো অন্য কোথাও যাচ্ছে। ও জানে না

এমন কোথাও।

শেষে নিজের সাথে আপোস করল রানা। পিছু নেয়ার দশ মিনিটের মধ্যে টোটার ড্রাইভার রানার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল। ওকে খসাবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করল না লোকটা। লামপিনি পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় স্পীড তুলল ঘণ্টায় নব্বই মাইল। টয়োটা আঠার মত পিছনে লেগে থাকল বটে, কিন্তু রানা বুঝল, এই পরিস্থিতিতে নিজেদের গন্তব্যে যাবে না ওরা। টোটা নির্দেশ দেবে, আগে কেউ কর্নাও।

তাই পিছিয়ে পড়ল রানা, কিন্তু ভান করল যানবাহনের ভিড়ে এগোতে পারছে না। সুকুমভিত রোড ধরে বেশ খানিকটা পিছিয়ে এল ও, তারপর দেব প্রজিং লেন হয়ে পড়ল রামা ফোর-এ। ওখান থেকে নাক বরাবর পশ্চিমে, লামপিনির দিকে। এ এক ধরনের জুয়া খেলা, টোটাকে আবার দেখতে পাবার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম।

ডিউ মিররে ট্যাক্সিটাকে দেখল না রানা। বোটানিক্যাল মিউজিয়াম লিঙ্ক রোড এলাকায়, পথের ওপর টয়োটা থামিয়ে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে নেমে পড়ল ও।

মিউজিয়ামের একধারে একটা সিঁড়ি, প্রতিটা ল্যান্ডিংে একটা করে জানালা রয়েছে। গত আট দিনে বারকয়েক ওই সিঁড়ির শেষে ল্যান্ডিংে উঠে জানালা দিয়ে লিঙ্ক রোডের উপর চোখ বুলিয়েছে রানা। মন্দিরটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখাতে পাওয়া যায়।

একটু পরেই দেখা গেল ওদেরকে। চোখে ফিল্ড গ্লাস তুলল রানা। ওদের একজন—টোটা নয়—ট্যাক্সি থেকে নেমে মন্দিরের বাগান ধরে এগোল। এক মিনিট পর অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে। একটু পর আবার তাকে দেখা গেল, ট্যাক্সির দিকে ফিরে আসছে, সাথে একজন লোক।

এই নতুন লোকটা হলুদ রঙের একটা আলখাল্লা পরে আছে। পুরোহিত। ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে জানালার ভেতর তাকাল সে। তার ঠোঁট জোড়া নড়তে দেখল রানা। সিধে হলো লোকটা। হাতে পাটির মত গোল করে মোড়া গোল্ড ক্লথটা। বাগানের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে ফিরে যাচ্ছে পুরোহিত।

স্টার্ট দেয়াই ছিল, আধপাক ঘুরে মন্দিরের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। গোল্ড ক্লথ নিয়ে মন্দিরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল পুরোহিত।

অবাক হয়ে দেখল রানা গোটা ব্যাপারটা।

চার

রানার প্রস্তাব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সোহেল। রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল বুদ্ধ-মূর্তির দিকে। 'না, এ আমার হাতে ঠিক মনে হচ্ছে না।' কথাটা বলে, ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করল সে।

'তুই আমাকে একটা সেট-আপ দিতে বলেছিলি, তারচেয়ে বেশি দিচ্ছি

আমি—সমাধান,' বলল রানা। 'পলিসি কি হবে, সেটা অবশ্য তুই-ই ঠিক করবি। কিন্তু আমি আবার বলছি, এই পদ্ধতিতে এগোলেই প্রিন্সকে যদি বাঁচানো যায়। আরও উপায় হয়তো আছে, কিন্তু সেগুলোর চেয়ে ঝুঁকি এতে কম।'

'এর সবটাই ঝুঁকি, রানা।'

'আবার ধরতে গেলে কোন ঝুঁকিই নেই।'

আরও দ্রুত পায়চারি শুরু করল সোহেল। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে। এই সুযোগে নিজের দিকটা ভেবে নিচ্ছে রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। ওর প্রস্তাব সোহেল যদি অনুমোদন না করে, দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে প্রিন্সকে জানিয়ে দেবে, ওর দ্বারা হলো না। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে অনেক ক্ষমতা এখন সোহেলের, কিন্তু একজন এজেন্টও নিজের অক্ষমতা জানাবার অধিকার রাখে। যে পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করতে চাইছে ও, সেটার কোন বিকল্প নেই এটা বুঝতে হবে সোহেলকে।

টোটার আয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছে রানা, তাই সোহেলকে সুনির্দিষ্ট একটা প্রস্তাব দিতে পারছে ও। মন্দিরটাকে বেছে নেয়ার পিছনে অনেক কারণ আছে টোটার। মন্দির একটা পবিত্র জায়গা, সেটাকে হত্যাকাণ্ডের মত জঘন্য একটা কাজে কেউ ব্যবহার করতে পারে, ধারণা করা কঠিন। দ্বিতীয় কারণ, ওই মন্দির থেকে পুরোটা লিঙ্ক রোড চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়।

টোটার উপস্থিতিতে গোল্ড ক্লথটা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেটা তুলে দেয়া হয়েছে একজন পুরোহিতের হাতে। কারও মনে সন্দেহ জাগার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ কাজটা গোপন করে করা হয়নি, অনেকেই দেখেছে। মন্দিরে গোল্ড ক্লথ, তৈজসপত্র, গালিচা ইত্যাদি দান করা সাধারণ একটা ব্যাপার। ওদের গোল্ড ক্লথটা লম্বায় তিন ফিটের কিছু বেশি হবে। যেভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, দেখে মনে হয়েছে, দশ বারো পাউন্ডের কম হবে না। গোল্ড ফাইবার বেশ ভারী হয়। শুধু কাপড়টারই ওজন হবে পাঁচ থেকে ছয় পাউন্ড।

দিনের বেলা সবার চোখের সামনে, অস্ত্রটা মন্দিরে রেখে এল টোটা। আরেকবার প্রমাণ হলো, তার সব কিছুতেই একটা স্টাইল আছে।

পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে ফিরল সোহেল। 'খাই বাদিন, হোমিসাইডের অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুই শুধু শুধু সময় নষ্ট করছিস।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'ওদের দু'জনের একজনকে মরতে হবে। কার মৃত্যু চাস তুই?'

আবার পায়চারি শুরু করল সোহেল। আড়চোখে টেলিফোনের দিকে তাকাল একবার। কিন্তু থামল না।

নিজের প্রস্তাবটা সম্পর্কে আরেকবার ভাবল রানা। এই সমাধানের মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে, কিন্তু ন্যায় বিচারের কোন অভাব নেই। সূক্ষ্ম এক মুহূর্তের এদিক ওদিক হলে সব ভেস্তে যাবে, ঠেকানো যাবে না সর্বনাশ, অথচ পদ্ধতিটা একেবারে পানির মত সহজ। এক কথায়, ক্লাসিক। কুকুরের মাংস কুকুর

খাবে।

পায়চারি না থামিয়েই জানতে চাইল সোহেল, 'কি কি দরকার তোর?'

রানা বুঝল, রাজি হয়েছে ব্যাটা। 'তিনটে জিনিস। একটা কেস। একটা ডার্করুম। আর গাড়িটা এক নজর দেখতে চাই।'

'আর কিছু না?'

'না।'

'কি ধরনের কেস?'

ব্যাখ্যা করল রানা। সিক্স রোড আর রামা ফোরের ইন্টারসেকশনে পুব দিকে মুখ করে পুরানো একটা অফিস বিল্ডিং আছে, ওটাকে ফেলে দেয়া হবে। একটা ব্রিটিশ ডিমোলিশন কোম্পানী, হিলি অ্যান্ড ট্যাফোর্ড, টেন্ডারটা পেয়ে কাজও শুরু করেছে। চারতলা পর্যন্ত সবগুলো কামরার দরজা-জানালা খোলার কাজ শেষ। ওটা একটা ছয়তলা বিল্ডিং। টপফ্লোরের একটা কামরা দরকার রানার। কেউ যেন জানতে না পারে।

'কিন্তু কর্নেল রামসাপা আমাকে জানিয়েছে,' বলল সোহেল, 'যে-সব বিল্ডিং থেকে বড় রাস্তাগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো সার্চ করা হবে। পাঁচ হাজার কামরার একটা তালিকা তৈরি করেছে পুলিস...'

'ওখানে আমি গেছি,' বলল রানা। 'ওদের চোখ ফাঁকি দিতে পারব।'

তবু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না সোহেল। মাথা নাড়ল। 'শোভাযাত্রা দেখার জন্যে লেবাররা ওখানে যাবে। সেদিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে...'

'ঠিকাদারদের সাথে যোগাযোগ কর,' পরামর্শ দিল রানা। 'পুলিস ছাড়া আর কেউ যেন ঢুকতে না পারে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল। 'হিলি অ্যান্ড ট্যাফোর্ড আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের অ্যামব্যাসাডারকে দিয়ে ওদের অ্যামব্যাসাডারকে ধরতে হবে। কি ধরনের ডার্করুম দরকার তোর?'

'স্পেশাল কিছু না। ফটোগ্রাফির দোকান হলে ভাল, নইলে জাস্ট একটা কামরা চাই। জায়গাটা লাইট-প্রুফ হতে হবে, যেখানে দিনের বেলায় এনলার্জার নিয়ে কাজ করা যায়। পুরানো বিল্ডিংটার যত কাছেপিঠে হয়। খোলা রাস্তায় বেশিক্ষণ থাকতে চাই না।'

'ক্যামেরা গিয়ার?'

'সে আমি নিজেই বেছে নেব।'

'কখন দেখতে চাস গাড়ি?'

'যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে পারিস তুই।'

নিজেদের অজান্তেই ওদের কণ্ঠস্বর এখন খাদে নেমে গেছে। এই মুহূর্তে যা কিছু বলছে ওরা, প্রতিটি শব্দ, ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ওদেরকে।

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল সোহেল, 'খুব বেশি সময় নেব না আমি।'

দরজার দিকে এগোল সোহেল। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে রানা। সেটাই রুটিন। 'ও হ্যাঁ, সোহেল, দুটো কথা ভুলে গেছি।' রানার কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল সোহেল। 'রাইফেল ক্লাবের একটা মেম্বারশিপ কার্ড দরকার আমার। হাজার গজ রেঞ্জে ঘণ্টা দুয়েক কাটাতে চাই। ব্যবস্থা করতে পারবি? আর...হ্যাঁ...একটা রাইফেলও দরকার পড়বে।'

অদ্ভুত এক মোহ আর মায়াজাল দিয়ে ঘেরা ব্যাংকক শহরটা। মনভোলানো নকশা নিয়ে আকাশে সোনার মিনার তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দিরগুলো। রঙিন, ঝলমলে কাঁচ লাগানো বহুতল হোটেল, গোড়ায় উজ্জ্বল সবুজ রঙের পাম গাছের বেড়। এখানে শ্বেত পাথরের উঠানে নেচে বেড়ায় ঝর্ণার ফেনায়িতমুখর পানি, সিল্ক আর রেশমি কাপড় পরা তাজা ফুলের মত মেয়েরা খোপায় অলঙ্কার নিয়ে হেঁটে বেড়ায়। মাটির পৃথিবীতে এ এক অপরূপ স্বর্গ, বিশেষ করে রাজকুমারীদের বিনোদনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে। দিনের বেলা গোলাপী রোদ খেলা করে নিঝুম বাগানে, আর নীল রঙের ঠাণ্ডা রাতে মোহময় সুরের জাল বোনে আকুল করা সঙ্গীত।

বাতিল বিল্ডিংের ছয়তলার একটা ঘরের কোণে দ হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা। স্লিপিং ম্যাটটা পুরানো, সুতো উঠে গেছে। মেঝেতে বালি আর ধুলো। দেয়ালে প্লাস্টার বলতে কিছু নেই, সব খসিয়ে ফেলা হয়েছে। বাতাসে শ্যাওলার গন্ধ। শেষ বৃষ্টির পানি ফাটল ধরা ছাদ থেকে দেয়ালে নামছে, সবুজ হয়ে গেছে ইঁটের রঙ। সন্দেহ নেই, ইলেকট্রিক হ্যামার প্রথম পড়বে এই ঘরেই।

কাজগুলো খুব তাড়াতাড়ি সেরেছে সোহেল, স্বীকার করতেই হবে রানাকে। ব্রিটিশ এমব্যাসীতে নিজেই গিয়েছিল সে, রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে হিলি অ্যান্ড ট্যাফোর্ডকে অনুরোধ করিয়ে রানাকে এই ঘর পাইয়ে দিতে কোন অসুবিধে হয়নি।

মৃত্যুর ঘ্রাণ পায়, এমনি একটা নাক নিয়ে এই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে ভূতটা। মাঝে মধ্যে ঘুমায় সে, কিন্তু হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়, আর একটা করে প্রশ্ন উঁকি দেয় মনে। দীনা...নামটা মন্দ নয়... কিন্তু কে ও? বি.সি.আই.-তে এমন অনেক মেয়ে আছে, যাদের চেনে না সে। তাদের কেউ? মনে হয় না। তাই যদি হত, পরিচয় গোপন করবে কেন? প্রিন্সের নিরাপত্তার দিকে কোন নজর নেই এই মেয়ের, নজর নেই টোটার দিকেও। চোখ রাখছে শুধু তার ওপর। কেন? সোহেলেরই বা এই উদ্ভট আচরণের মানে কি? এত রাখ রাখ ঢাক ঢাক কিসের? আসল মতলবটা কি? ওর কাছে মন খুলছে না কেন?

বাতিল বিল্ডিংের কাছাকাছি একটা ডার্করুমেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছে সোহেল। যখন খুশি সেটা ব্যবহার করতে পারবে রানা। জায়গা মত টেলিফোন করে প্যালেস সিকিউরিটির অনুমতি আদায় করতেও বেগ পেতে হয়নি তাকে, একটা পুলিস কারে চেপে রয়াল গ্যারেজে পৌঁচেছে ওরা। কাগজ-পত্র চেক করার জন্যে দু'জায়গায় থামানো হয় ওদেরকে।

আশ্চর্য একটা গাড়ি। ক্যাডিলাক ফ্লিটউড এলডোরাডো। হাতির দাঁতের মত সাদা, মেটাল ফিটিংস সব সোনালি। তিনশো চল্লিশ ঘোড়ার ইঞ্জিন দুই টন ওজনের এই গাড়িটাকে ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল গতিতে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কোচ সেকশনে ছয়টা সীটের ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে দুটো ভাঁজ করা যায়। পিছনের মেইন সীটটা অন্যগুলোর চেয়ে নয় ইঞ্চি বেশি উঁচু করা হয়েছে, আরোহী যাতে চারদিকটা ভাল করে দেখতে পায়। আউট রাইডার আর কমান্ড সিকিউরিটি ভেহিকেলের সাথে রেডিও যোগাযোগ রক্ষার জন্যে রয়েছে চারটে এরিয়াল। সাইড প্লাটফর্মগুলো স্টীল দিয়ে মোড়া, গায়ে সাদা রাবারের খুদে খুপরি। বুলেট আর মেহমানের মাঝখানে নিজেকে দাঁড় করাবার জন্যে ওখানে পা রাখবে গার্ড। বিশেষ ইকুইপমেন্টের মধ্যে রয়েছে পুলিস সাইরেন, ইমার্জেন্সী লাইট, ফায়ার বটল, মেডিকেল কিট, বুলেট প্রুফ টায়ার।

সিলিং রয়েছে পাঁচটা, প্রত্যেকটি তোলা এবং নামানো যায়। তার মধ্যে একটা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, বাকি চারটে বুলেট প্রুফ ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক।

সোহেলকে বলেছে রানা, গাড়ির মাথায় কোন ছাদটা ব্যবহার করা হবে যেভাবে হোক জানতে হবে। সোহেল জানিয়েছে কাজটা কঠিন। এ ব্যাপারে কেউ একা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সউদী আর থাই সিকিউরিটি বলবে, সব ক'টা প্লাস্টিক সিলিং লাগানো হোক। কিন্তু প্রিন্স চাইবেন, ছাদের অস্তিত্ব যেন না থাকে। কোথাও গেলে খোলা গাড়িতে করেই যান তিনি। একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, প্রিন্স ফরহাদের সাথে থাই প্রিন্স কুমারও থাকবেন। তিনিও গাড়িতে ছাদ চাইবেন না। ব্যাংককের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে থাইদের একটা গর্ব আছে, প্রিন্স কুমার মেহমানকে দেখাতে চাইবেন বুলেট প্রুফ শিল্ড ছাড়াও ব্যাংককের রাস্তা দিয়ে নিরাপদে ভ্রমণ করা যায়।

তবু, যতটা জানা সম্ভব জানতে বলেছে রানা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাড়ির ছাদ কি ধরনের হবে তার ওপর নির্ভর করবে অনেকগুলো বিষয়—দূরত্ব, ট্র্যাজেক্টরি, ট্রিগনোমেট্রি, ব্যালিস্টিকস ইত্যাদি। একটা শিল্ড সরিয়ে নিলে গোটা সেট-আপ বদলে যাবে। এমন কি স্নাইপিং-পোস্টের জায়গা পর্যন্ত বদলে যেতে পারে।

রানাকে এই ধারণা নিয়ে কাজ করতে হবে যে ওরা যা জানতে পারবে, টোটাও তা জানবে।

টোটা সাধারণ একজন ভাড়াটে খুনী নয়। পথের ধারে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকবে সে, সুযোগ পেলে গুলি করবে, তার সম্পর্কে এ-কথা ভাবাই যায় না। একজন প্রফেশনাল, কাজেই এমন একটা প্ল্যান তৈরি করবে সে যাতে ভাগ্য ও সুযোগের ওপর ভরসা করতে না হয়। সেজন্যেই একা আসেনি সে, দলবল সাথে নিয়ে এসেছে। দলের লোকদের প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগাচ্ছে, প্রয়োজনীয় তথ্য যেখান থেকে যা পাবে সব জোগাড় করবে। প্রতিরক্ষার ধরনটা সম্পর্কে জানবে তারা, এর কোথায় দুর্বলতা আছে তাও

জানবে। খুন করার আগে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের ভাঙতে হবে।

কাজেই ধরে নিতে হবে, সব জানে তারা। সব।

শুধু এই ভূতের কথা জানবে না। যে ভূতটা দ হয়ে শুয়ে আছে। মৃত্যুর গন্ধ নেয়ার অপেক্ষায়।

একশো পঁয়ত্রিশ পূরণ দুই পূরণ আট, সমান সমান দু'হাজার একশো ষাট।

ছোট ঘরের জানালাটা যেন একটা ফ্রেম, ফ্রেমের মাঝখানে রয়েছে প্রা চুনা চেদি, সকালের রোদে ঝলমল করছে। মন্দিরের পাঁচিলগুলো সাদা, বিশাল সোনালি ফটক ছাড়া আর কোথাও কোন ফাঁক নেই। ফটকের বেশির ভাগটা বাগানের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। পাঁচিলের ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে চকমকে সোনালি গম্বুজ। সরু মিনারগুলোকে ঠেক দিয়ে রেখেছে গম্বুজটা। মিনার আর গম্বুজের মাঝখানে একসার ছোট ফাঁক, জানালার মতই দেখতে, ভেতরে অন্ধকার। একমাত্র এগুলোর একটা থেকেই একজন মার্কসম্যান নিউ রোডের ওপর চোখ রাখতে পারে।

মন্দিরের ওই গরাদহীন জানালা আর রানার মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান। জানালাগুলো ছয়তলার মত উঁচুতে, নিজের জায়গা থেকে সরাসরি ওগুলোর দিকে তাকাতে পারছে রানা। কিন্তু সময়টা গ্রীষ্ম, সূর্যটা অনেক ওপরে, জানালাগুলোর ভেতর সারা দিন ছায়া থাকে। যে-কোন ম্যাগনিফিকেশনের অপটিক্যাল লেন্সই ব্যবহার করা হোক, জানালার ভেতর কি আছে না আছে সমস্ত খুঁটিনাটি দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু ক্যামেরার সাহায্যেই তা দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

একটা ক্যামেরা, টাইম এক্সপোজার ঠিকমত সেট হলে অন্ধকার কামরার এমন অনেক কিছুই দেখতে পায়, মানুষের খালি চোখে যা ধরা পড়ে না। কাছে পিঠে সোহেল ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করবার যে দোকানটা বাছাই করেছে, সেখান থেকেই ক্যামেরা আর লেন্স কিনতে হয়েছে রানাকে। অন্য কোথাও থেকে কিনলে আরও ভাল জিনিস পেতে পারত, কিন্তু হাতে সময় ছিল কম। একটা পেনট্যাক্স এক্স ফিফটিন জুটেছে কপালে, পঁচিশ এম এম সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স, সাথে একশো পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার লেন্স, আর ×2 অটো টেলিকনভার্টার। এই সাথে একটা স্টক অ্যাডাপ্টার নেয়ার ফলে রানার বিনকিউলারটাও জুড়ে দেয়া যাবে ক্যামেরার লেন্সের সঙ্গে। ফলে একশো পঁয়ত্রিশ পূরণ দুই পূরণ আট, অর্থাৎ সর্বমোট ফোকাল লেংথ পাওয়া যাচ্ছে দু'হাজার একশো ষাট মিলিমিটার। ম্যাগনিফিকেশন পাওয়া যাচ্ছে ×১৬।

যেদিক খুশি ঘোরানো যায় এই রকম খুদে মাথা সহ একটা ট্রাইপড জোগাড় হয়েছে, সেটার ওপর ক্যামেরা সেট করেছে রানা। [illegible] যথেষ্ট শক্ত, ভার সহ্য করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বিল্ডিংটা পুরানো বলে যানবাহনের আসা-যাওয়ার সঙ্গে কাঁপবে মনে করে সাবধানতা অবলম্বন করেছে ও, ক্যামেরায় লাগিয়েছে প্যান গ্লাস-এর থারটি-সিক্স ফ্রেম। ডেপথ অভ ফিল্ডের ব্যাপারে বিশেষ সমস্যা নেই, কারণ বিনকিউলারটা জুড়ে দেয়ায় মাঝখানের জানালা,

ভেতরের দেয়াল সহ, অ্যাপারচারের ছয় ফিটের মধ্যে এসে গেল। প্রখর রোদের জন্যে এইচ-ফোর ভিভো ইয়েলো ফিল্টার ব্যবহার করছে রানা। সোনালি গম্বুজটা এতই চকমকে যে কার্ডবোর্ড দিয়ে তিনফুট লম্বা একটা লেন্সহুড তৈরি করে নিয়েছে সে নিজ হাতে।

একঝাড় ম্যাগনোলিয়া আড়াল করে রেখেছে মন্দিরের ফটক, শুধু ওপরের অর্ধেকটা দেখতে পাওয়া যায়। ফটকটা প্রায় পনেরো ফিট উঁচু, মন্দিরে ঢোকার সময় পুরোহিত আর পূজারীদের দেখতে পাবে না ও। তার মানে দুটো চোখই খিলান আকৃতির জানালার ওপর রাখতে হবে ওকে।

দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মাঝখানের জানালায় নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। বিভিন্ন স্পীড ও অ্যাপারচারে ছয়টা ছবি নিল। দুপুরের আগে আরও দু'বার টের পাওয়া গেল নড়াচড়া। আরও দশটা ছবি নিল ও।

নিচে নেমে দোকানের ডার্করুমে চলে এল রানা। আধ ঘণ্টা কাজ করল। ভিজে নেগেটিভগুলো দেখে খুশি হয়ে উঠল মন। তিনটে ছবি খুবই ভাল উঠেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব শুকিয়ে গেল। ষোলোটার মধ্যে পাঁচটা ভাল, একটা একেবারে নিখুঁত।

খিলান আকৃতির জানালায় একজন লোকের মাথা আর কাঁধ পরিষ্কার ফুটেছে। এমনকি স্মোকড গ্লাসের আকৃতি পর্যন্ত স্পষ্ট ধরা যায়—ওপর দিকটা একটু চ্যাপ্টা, ক্রমশ বেঁকে গিয়ে নেমে এসেছে সাইড দুটো, লেন্সের ওপরের কিনারার সাথে প্রায় একই লেভেলে রয়েছে একটা ধাতব নোজ পীস।

এইটুকু শুধু দেখার দরকার ছিল রানার। এখন আর কোন সন্দেহ নেই। থাই আর সউদী সিকিউরিটি যদি টের না পেয়ে যায়, প্রিন্সকে লক্ষ্য করে ওখান থেকে করা হবে গুলি। ফারা চুলা চেদির ওই খিলান আকৃতির জানালা দিয়েই।

উনত্রিশ তারিখে আসছে প্রিন্স, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা, আর মাত্র তিনদিন।

স্মোকড গ্লাস পরা লোকটার চেহারা পরিষ্কার চিনতে পারল না রানা। কিন্তু তার পরিচয় সম্পর্কে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। ছবিতে যতটুকু দেখা গেল, বুঝতে অসুবিধে হয় না এ-লোকের আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাব। একজন প্রফেশনালের প্রতিকৃতি। নিখুঁত ছবিটা ডার্করুমে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। ওটা কেউ দেখলে কিছু এসে যায় না। নেগেটিভগুলো পকেটে ভরে নিয়েছে ও।

ওখান থেকে বন্দুকের দোকান এক মাইল। পৌঁছুতে লাগল আধঘণ্টা। কিছুটা রিকশায় এল রানা, কিছুটা পায়ে হেঁটে—হেঁটে আসার সময় কেউ পিছু লেগেছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করা হয়ে গেল। গোপনীয়তার মধ্যে এখন কোনরকম খুঁত থাকা চলবে না।

এই মুহূর্তে রানা একা। আজ থেকে তিনদিন পর সিঁড়ি বেয়ে বাতিল বিল্ডিঙের টপ ফ্লোরে ওঠার সময়ও একা থাকতে হবে ওকে। সেদিন কোথায় থাকবে ও, সোহেল ছাড়া আর কারও জানা চলবে না।

নিজের মনমত একটা অস্ত্র বেছে নিল রানা। অস্ত্রটা সবদিক থেকে চমৎকার, দেখলে এমন কি টোটাও রানার পছন্দের প্রশংসা না করে পারত না।

জায়গাটা বিশাল, কিন্তু গোলক ধাঁধার মত। ছাদের কাছাকাছি কোথাও থেকে আলো আসছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে দূর হয়নি। ভেতরে ঢুকেই প্রথমে যেটা লক্ষ করল রানা, সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে বড়সড় মানুষ, কাগজের তৈরি। শুধু দাঁড়িয়ে নেই, কোথাও কোথাও একটার ওপর একটা শুয়ে আছে, ছোটখাট পাহাড়ের মত উঁচু। নারী ও পুরুষ, দু'ধরনের ঘুড়ি দেখল রানা।

কান পাতল। গুদামের ভেতর কোন শব্দ নেই, তবে রাস্তা জোর ধরে যে-সব যানবাহন যাচ্ছে সেগুলোর ভাইব্রেশন অনুভব করল পায়ের তলায়। ভেতরে ঢুকে আলো জ্বলতে দেখেছে ও, তার মানে কেউ আছে।

গাঢ় ছায়া থেকে ভেসে এল কণ্ঠ, 'এরচেয়ে ভাল জায়গা পেলাম না।'

'আসল কথা কতটুকু নিরাপদ?'

'সুই সুক স্ট্রী-র চেয়ে বেশি। এখানে কারও আসা-যাওয়া নেই।'

বিশাল ছাদের নিচে পরস্পরের দিকে এগোল ওরা, যেন দু'জন লোক রেলওয়ে স্টেশনে দেখা করছে, শেষ ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে।

'বেরুবার রাস্তা?' জানতে চাইল রানা। বড় জায়গা ওর পছন্দ নয়। জায়গা ছোট হলে দ্রুত কেটে পড়া যায়।

হাত তুলে দেখাল সোহেল, বলল, 'একটা ওই যে, আরেকটা ওদিকে, শেষ কোণে। দুটোরই চাবি আছে, এই সেটটা তোর জন্যে।'

রিঙটা নিল রানা। খুব খারাপ করেনি সোহেল, ভাবল ও। এখান থেকে বাতিল বিল্ডিং পায়ে হেঁটে তিন মিনিটের পথ। এখানে ঢোকার আগে লক করেছে, পাশাপাশি একই রকম দেখতে অনেকগুলো দরজা, এক একটা দিয়ে এক-এক গুদামে ঢোকা যায়। দরজাগুলোর সামনে পাহাড় হয়ে আছে কাঠের বাক্স, আর সার সার দাঁড়িয়ে আছে খালি ট্রাক, আড়াল হিসেবে চমৎকার।

আধো অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে চারদিকে আরেকবার ভাল করে তাকাল রানা। লম্বা করা বাঁশের সাথে অসংখ্য ঘুড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, মৃদু-মন্দ বাতাসে একটু একটু দুলছে সেগুলো। পুরুষগুলোর ঘাড়ের ওপর ঝুঁটি আছে, মেয়েদের রয়েছে লম্বা লেজ। কোন কোনটা ড্রাগন আকৃতির। হাসল রানা মেয়েদের দুরবস্থা দেখে।

'খেলা কবে?' জানতে চাইল রানা। কাগজ পড়ার সময় পায়নি ও, কিন্তু ঘুড়ির এই সমাবেশ দেখে আন্দাজ করতে পারছে, প্রিন্সের আগমন উপলক্ষে ঘুড়ি ওড়াবার একটা আয়োজন হবে।

'আগামী মাসের পয়লা তারিখে,' বলল সোহেল। 'মোটর শোভাযাত্রা শেষ হবার আগে কেউ এখানে আসবে না। তুই কতদূর এগোলি?'

প্রিন্টটা দেখাল রানা। 'ভাল করে শুকায়নি এখনও।'

পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে প্রিন্টের ওপর আলো ফেলল সোহেল। স্মোকড গ্লাস পরা মুখটা দেখল।

'তার মানে শিওর হয়ে গেলি তুই,' মুখ তুলে বলল সোহেল।

'হানড্রেড পারসেন্ট।'

'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'হোয়াট?'

'তোর এই প্ল্যান এখনও আমি অনুমোদন করিনি,' বলল সোহেল। থমথমে হয়ে উঠেছে চেহারা। 'শর্তটা মেনে নিলে অনুমতি পাবি।'

'খুব আড়ামি হচ্ছে! যাই হোক, কেন কি করছিস তুই-ই জানিস—জবাব তৈরি রাখিস। এখন শোনা যাক, কি শর্ত?'

'ও গুলি করবে, তুইও গুলি করবি,' বলল সোহেল। 'ওর আগে তুই গুলি করবি না। দুটো গুলি এক সাথে হবে।'

হেসে উঠল রানা। এই প্রস্তাব যে অবাস্তব, সোহেলও তা জানে। দরাদরির সুবিধের জন্যে হাতে রেখেছে একটু সময়।

'একটা সেকেন্ড বেশি দে আমাকে,' বলল রানা।

গম্ভীর ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল, বলল, 'কিন্তু এক সেকেন্ডের বেশি না।'

'প্রোগ্রাম সম্পর্কে কিছু জানতে পারলি?' প্রশ্ন করল রানা।

'কেউই এখনও কিছু জানে না।'

'কিন্তু আমাদের জানতে হবে।'

রানার তীক্ষ্ণ গলা শুনে প্রিন্টটা থেকে মুখ তুলে তাকাল সোহেল। দু'জনেরই নার্ভ টান টান হয়ে আছে, ধৈর্য ধরা এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

'পরিস্থিতির ওপর নজর আছে আমার,' যতটা সম্ভব শান্তভাবে বলল সোহেল। 'বেশি চাপ দিলে ওদের কাছ থেকে যে-টুকু সাহায্য পাচ্ছি তা-ও আর পাব না। টোটার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে এমনিতেই কর্নেল রামসাপাকে বিরক্ত করে তুলেছি আমি...'

'দূতাবাসের ওরা কি কোন তথ্য দিতে পারছে না?'

'রাষ্ট্রদূত জানলে আমিও জানব,' বলল সোহেল।

'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর,' নিজের হাতের তালুতে মৃদু একটা ঘুসি মারল রানা। 'হয় প্রিন্সের প্রোগ্রাম সম্পর্কে সব তথ্য পেয়ে গেছে টোটা, তা না হলে একাধিক গান-পোস্ট বসাচ্ছে সে। কাজেই প্রিন্সের প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের জানতেই হবে।'

রানাকে শান্ত হবার জন্যে এক মিনিট সময় দিল সোহেল, তারপর বলল, 'তোর কি মনে হয়? সত্যিই টোটা একটার বেশি গান-পোস্ট বসাবে? নাকি প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানে সে?'

'থাই সিকিউরিটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না আমি,' বলল রানা। 'কোথাও ফুটো থাকলেও থাকতে পারে। আমার মনে হয়, আছে। টোটার গান-পোস্ট সম্ভবত এই একটাই। গোল্ড বুদ্ধা নিজে মন্দিরে নিয়ে এসেছে দেখে এই কথা বলছি আমি। শোভাযাত্রা কোন পথ ধরে যাবে তা না জানলে টোটার মত একজন লোক নিজে অস্ত্র বয়ে নিয়ে যেত না। একজন

ওয়াকিফহাল লোকের আচরণ এটা।'

'এনকোয়েরি করে যতটুকু জেনেছি,' বলল সোহেল, 'শোভাযাত্রার ফাইন্যাল রুট যেটাই হোক, ধরে নেয়া হয়েছে, লিঙ্ক রোড তার মধ্যে থাকতে বাধ্য।'

'কারণ?'

'অনেকগুলো। শহরের একটা গর্ব হলো লিঙ্ক রোডের ইসলামিক হসপিটাল। প্রিন্স ওটা দেখতে চাইবেন। ওই রাস্তা ধরে শোভাযাত্রা গেলে রাস্তার দু'পাশে লোকজনদের দাঁড়াবার জন্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে। লিঙ্ক রোডের বদলে রামা কোরের অংশবিশেষ ব্যবহার করলে সে-সুবিধেটুকু মিলবে না। পুলিস বলছে, দর্শকদের সামলানোও একটা বিকট সমস্যা, সেটাকে আরও কঠিন করে তোলা উচিত হবে না।'

'বলে যা।'

'আরও একটা ব্যাপার প্রায় নিশ্চিত, শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদ থেকে উত্তর দিকে যাবে, তারপর বাঁক নেবে পুব দিকে, কারণ ওদিকে রয়েছে সউদী দূতাবাস, তারপর যাবে দক্ষিণ দিকে, কারণ ওদিকে রয়েছে সামপিনি পোলো গ্রাউন্ড, সবশেষে পশ্চিমে ঘুরবে রাজপ্রাসাদে ফেরার জন্যে। সামপিনি থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরতে হলে রেলওয়ে স্টেশন ছুঁয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ রামা ফোর ধরে আসতে হবে, কারণ ওটাই একমাত্র রাস্তা। আর রামা ফোর থেকে অন্য কোথাও যেতে চাইলে লিঙ্ক রোড ব্যবহার করতে হবে। হতে পারে টোটাও হিসেব করে এই ধারণাটা পেয়ে গেছে, এটার ওপর নির্ভর করেই প্ল্যান করেছে সে...'

'হয়তো তাই,' বলল রানা। 'কিন্তু তবু আমি শিওর হতে চাই। এই ব্যাপারটা যেভাবে হোক আমাকে জানা।'

রানার ভয় থাই সিকিউরিটিকে নিয়ে। একেবারে হয়তো শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেবে, লিঙ্ক রোড ধরে শোভাযাত্রা যাবে না। তাতে টোটার উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। তার সাথে রয়েছে বাছাই করা চারজন মার্কসম্যান, তাদেরকে বসাবার প্যাটার্নটা বদল করলে যে-পথ দিয়েই শোভাযাত্রা যাক, তাদের কারও না কারও রাইফেলের সামনে দিয়ে যেতে হবে। সন্দেহ নেই, টোটা নিজে থাকবে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পোস্টে। দুনিয়ার যে-কোন শহরে শুধু মিছিল যাবার মত বড় রাস্তা মাত্র কয়েকটাই থাকে।

দু'সারি কাঠের বাক্সের মাঝখানে পায়চারি করছে সোহেল। ওর জন্যে দুঃখ হলো রানার। একটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে। হেড অফিসে বসে পাঁচজন ক্র্যাক অপারেটরকে ব্রিফ করছিল সোহেল। আধুনিক কমপিউটারের মতই জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেটা। কিভাবে অনুপ্রবেশ করতে হবে, সাহায্যদাতাদের কোথায় খুঁজতে হবে, খুঁজে পাবার পর কাকে কোথায় পাঠাতে হবে, এরা সবাই বিশ্বস্ত কিনা পরীক্ষা করার কৌশল, কোত্থেকে কাকে দিয়ে উদ্ধার করতে হবে চিঠিগুলো, কার কাছে গেলে পথ চেনাবার জন্যে লোক পাওয়া যাবে, রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা কি

হবে, কাভার স্টোরি, সময়ের হেরফের হয়ে গেলে তখন কি করা, নিয়মিত প্যাটার্ন, এইরকম এক হাজার একটা বিষয়ে নির্দেশ দেয়া শেষ করেছিল সোহেল, মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে। হাতে সময় ছিল না, কারণ অপারেটরদের জন্যে একটা প্লেন অপেক্ষা করছিল, এবং গোটা অপারেশনটাই নির্ভর করছিল চাঁদের আলোর ওপর। সেবার যে প্ল্যানটা তৈরি করে সোহেল সেটা ছিল একটা মাস্টারপীস, কোথাও কোন গলদ দেখা দেয়নি।

কিন্তু এখানে অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে বেচারা। ওকে সাহায্য করার জন্যে পঞ্চাশটা অফিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট বা রেফারেন্স সোর্স নেই, আছে সবেধন নীলমণি দূতাবাস আর একজন মাত্র এজেন্ট।

'দূতাবাস থেকে অনেক খবরই খাচ্ছিস তুই,' বলল রানা। 'ওরাও নিশ্চয়ই তোর কাছ থেকে খবর আদায়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে?'

হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে রানার সামনে দাঁড়াল সোহেল। এই মুহূর্তে তাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো না, মনে হলো গম্ভীর ও সতর্ক। 'এই মিশনের সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বস্ মাথা ঘামাতে বলেছেন আমাকে, আমিই মাথা ঘামাব। তোর উচিত আসল কাজের ওপর সম্পূর্ণ মনোযোগ...'

'সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করছে তোকে দীনা, তাই না?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর সোহেল বলল, 'দেখ, ইচ্ছে থাকলেও সব কথা তোকে এখন জানানো সম্ভব নয়। আমি চাই তুই শুধু একটি ব্যাপারে মাথা ঘামাবি। অন্য কোন সমস্যা যদি থাকে, আমরা সামলাব।'

'তুই জানিস, বাইরে অপেক্ষা করছে সে? তোর পিছু নিয়ে যে এসেছে?'

থতমত খেয়ে গেল সোহেল। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমি তো...'

'এ যে ঘটবে, জানতাম,' বলল রানা। 'তুই অপারেশনটা ও.কে. করতেই হোটেল ছেড়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছি আমি। পনেরো দিনের মধ্যে এই প্রথম আমাকে হারিয়ে ফেলে দীনা। তার জানা আছে, তুই-ই আমার একমাত্র কন্টাক্ট। আমাকে হারিয়ে ফেলার পর থেকেই তোর ওপর নজর রেখে আসছে ও। এ না হয়েই যায় না। আমাকে চোখে চোখে রাখা সাংঘাতিক দরকার ওর। কারণটা কি, তুই জানিস?'

হোটেল ইন্টারকন ছাড়ার পর থেকে যখনই সোহেলের সাথে কোথাও দেখা করেছে রানা, প্রতিবার চেক করে দেখে নিয়েছে কেউ তাকে ফলো করে এসেছে কিনা। আজ এই গুদামে আসার সময় ছোট্ট একটা কৌশল খাটিয়েছে ও, তাতেই ধরা পড়ে গেছে দীনা। গুদামের দরজা ছাড়িয়ে খানিক দূর এগিয়ে গিয়েছিল ও। ভেবেছিল সোহেলের পিছু নিয়ে কেউ যদি এসে থাকে, ওকে গুদামে ঢুকতে না দেখে অবাক হয়ে যাবে, এবং ও কোথায় যায় দেখার জন্যে পিছু নেবে। হয়েছেও ঠিক তাই। পাঁচশো গজ হেঁটে গিয়ে একটা দোকান থেকে দিয়াশলাই কেনে ও, তারপর ফিরতি পথ ধরে। গুদামে ঢোকার সময় দেখবার লক্ষ করেছে মেয়েটাকে, একটা ভাঙাচোরা ট্রাকের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

'পিছু নিয়ে এসেছে... ডিসটার্বিং!'

'বোঝাতে চাইছিস, ব্যাপারটা তুই জানিস না। আমি কি বিশ্বাস করছি তা নাই বা শুনলি। দীনা আমাকে খুঁজবে জানতাম বলেই সব সময় তুই যাতে আগে পৌঁছাস সে-ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম আমি। কৌতূহল ফলাবার ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে বলবি, কি চায় ও?'

'বিশ্বাস কর, আমি জানি না!' হয় অভিনয়টা চমৎকার হলো, না হয় সত্যি জানে না সোহেল।

'করলাম বিশ্বাস,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'কিন্তু একটা ধারণা তো করতে পারিস?'

মাথাটা একদিকে কাত করে চিন্তামগ্ন হলো সোহেল।

'কাজটা আমি ধরার পর থেকেই ওরা আমার পিছু নিয়েছে,' বলল রানা। 'খেটে মরছি আমি, ফল ভোগ করছে ওরা। প্রিন্সকে রক্ষা করতে চাইছে অথচ ওদের নিজস্ব কোন প্ল্যান নেই, এ কেমন কথা! বিপদটা কোথায়, তুইও জানিস। এখন যদি ওরা বিরক্ত করে আমাকে, যে-কোন একটা ভুল করে বসতে পারি আমি। মিশনটা ব্যর্থ হলে তখন কিন্তু আমাকে দায়ী করতে পারবি না।'

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বলল সোহেল, 'ওরা প্রিন্সের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে কাজ করছে না।'

'ঠিক জানিস? নাকি, তোর ধারণা?'

'আমি তো আগেই বলছি, জানি না। ধারণা করতে বলেছিস, করলাম। দীনা আর তার সঙ্গীরা প্রিন্স সম্পর্কে তথ্য চাইছে না—না আমার কাছ থেকে, না অন্য কারও কাছ থেকে। ওরা প্রিন্সের প্রোগ্রাম বা টোটার সেট-আপ সম্পর্কেও আগ্রহী নয়। আমার বিশ্বাস, তুই আর দীনা, তোরা দু'জন একই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছিস না। সেজন্যেই মেয়েটা সম্পর্কে সব কথা তোকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি আবারও বলছি, অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে তোকে যে দায়িত্বটা দেয়া হয়েছে শুধু সে-ব্যাপারে মনোযোগ দে।'

'তুই বলছিস ওদেরটা প্রোটেকশন-মিশন নয়?'

'তা আমি একবারও বলিনি। ওদেরটাও প্রোটেকশন-মিশন।'

'কিন্তু এইমাত্র তুই বললি...'

'বলেছি, ওরা প্রিন্সকে প্রোটেক্ট করছে না।'

'তাহলে কাকে প্রোটেক্ট করছে?'

'তোকে।'

হাসি পেল রানার। পরমুহূর্তে মনে হলো, তাই তো!

পালা করে শুধু ওরা তিনজন ফলো করছিল ওকে—চটিন বেলুন, তালপাতার সেপাই আর শুয়োপোকা। ওরা লক্ষ করেছে, টোটার ট্রাভেল প্যাটার্ন জানার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু ওকে ছেড়ে একবারও টোটার পিছু নেয়নি। টোটাকে একসময় হারিয়ে ফেলল ও, কিন্তু তখনও ওরা লেগে থাকল

ওরই পিছনে, টোটাকে খুঁজে বের করার কোন চেষ্টা করল না। তারপর, ও প্লেনে করে তেল আবিবে চলে যেতে পারে এই ভয়ে ওর পিছু পিছু এয়ারপোর্ট গিয়েছিল দীনা।

'আমাকে প্রোটেক্ট করছে?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল রানা। 'কেন, আমি কি নিজেকে রক্ষা করতে জানি না?'

'সব প্রশ্নের উত্তর তোর জানার দরকার...'

ঘুড়িগুলো দোল খেতে শুরু করল। রাস্তা থেকে বাতাস ঢুকছে। তার মানে দরজাটা কেউ খুলছে।

গলা একটু চড়িয়ে রানা বলল, 'বেশ, জানলাম না। কিন্তু আমার সামনে থেকে ওদেরকে সরে থাকতে হবে। এখুনি বেরিয়ে গিয়ে শুয়োপোকাকে বল, আর কারও ডিমে তা দিক—আমি এখন বড় হয়েছি।' সোহেলের হাত থেকে প্রিন্টটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল ও। 'তুই যেতে পারিস। দশ মিনিট পর বেরিয়ে আমি যেন ওদের কাউকে না দেখি।'

বিকেল বেলা গুদাম থেকে বেরিয়ে রাইফেল ক্লাবে যাওয়ার প্রোগ্রামটা বাতিল করে দিল রানা, পৌচ্ছবার একটু পরই ফুরিয়ে যাবে আলো। বাতিল বিল্ডিঙে ঢোকার আগে চারপাশটা ভাল করে চেক করে দেখল ও, পিছু নিয়ে আসেনি কেউ। গুদাম থেকে বেরিয়ে সোহেল বা দীনা, দু'জনের কাউকেই দেখেনি। হয় তাকে সাথে করে নিয়ে গেছে সোহেল, নয়তো তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে বাধ্য করেছে।

পরদিন রাইফেল ক্লাবে এল ও। সোহেলের সংগ্রহ করা মেম্বারশিপ কার্ড থাকায় কোন অসুবিধে হলো না। হান্কভার্না রাইফেল, স্কোপ-সাইট ফিট করা অবস্থায় আগেই ক্লাবে পাঠিয়ে দিয়েছিল ডিলার।

সব ধরনের হান্কভার্নাই ভাল, কিন্তু সবচেয়ে ভাল হান্কভার্না পাঁচশো একষট্টি। এটা একটা পয়েন্ট তিন পাঁচ আট ম্যাগনাম, সেমিঅটো ফায়ার, থ্রী শট ম্যাগাজিন, সাড়ে পঁচিশ ইঞ্চি ব্যারেল, হ্যান্ড-চেকারড ওয়ালনাট স্টক, করোগেটেড বাট প্লেট এবং সেই সাথে স্লিং সুইভেল। পিস্তল-গ্রিপটা রোজউড দিয়ে মোড়া। ওজন পৌনে আট পাউন্ড, ব্রিচ-প্রেশার প্রায় বিশ টন পি.এস. আই। একশো পঞ্চাশ গ্রেন বুলেট বহুদূর পর্যন্ত চলবে সোজা ট্র্যাজেক্টরিতে।

দু'ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটা গুলি করল রানা, সময় ও যত্ন নিয়ে। প্রতিবার গুলি করে টার্গেট চেক করল, স্কোপের অ্যালাইনমেন্ট অ্যাডজাস্ট করল। শেষের দিকে প্রতিটি গুলি ভেদ করে গেল টার্গেট। ডান কাঁধ যদিও কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু লাভ হয়েছে এই যে রিকয়েলের ধাক্কা খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে পেশীগুলো।

ক্লাবে এমন কেউ নেই যাকে রাইফেলটা বাতিল বিল্ডিঙে পৌঁছে দিতে বলা যায়। তাছাড়া, সেখানেও কেউ নেই। কাজেই টয়োটায় করে এটাকে নিয়ে নতুন কার-পার্ক পর্যন্ত এল রানা। জায়গাটা রামাফোর হাউজিং, লিঙ্ক রোডের কাছাকাছি। ওখান থেকে বাকি পথটুকু হেঁটে এল। নিরাপত্তার দিকটা

মনে রেখে ঘুরপথে আসতে হলো ওকে। টোটা মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল গোল্ড কুপ, আর রানা বাতিল বিল্ডিঙে নিয়ে এল সস্তাদরের একটা মোড়ানো কার্পেট।

পাঁচ

ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ আটাশ তারিখ মাঝরাতে সোহেলের সাথে দেখা হলো রানার। 'রেডিও শুনছিস?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কাল একটা পকেট সাইজ ট্রানজিস্টর দেয়া হয়েছে ওকে। ভলিউম না দিয়ে কানে স্পিকার-প্লিন ঢুকিয়ে খবর শোনে ও। প্রিন্স আসছেন, তাই বিশেষ বুলেটিন প্রচার করা হয়। তাছাড়া, নিয়মিত খবরেও এই সফর সম্পর্কে নানারকম তথ্য থাকে। সরকারী আয়োজন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য শুনেছে রানা, যেগুলো সূত্র হিসেবে কাজে লাগবে। প্রিন্স হাসান-হোসেন এতিমখানায় যাবেন, তার মানে রাজবীথি রোডটা ব্যবহার করা হবে। রামাফোর দিয়ে সামপিনি বক্সিং স্টেডিয়ামেও যাবেন তিনি। কিন্তু প্রিন্সের প্রোগ্রাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। শোভাযাত্রা কোন পথ দিয়ে যাবে, এখনও জানে না রানা।

আজ রাতে সাড়ে ন'টার খবরে বলা হয়েছে, প্রিন্স কুমার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এ-ব্যাপারে রানার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল সোহেল।

'কিছু এসে যায়?' কথা ছিল, শোভাযাত্রার সময় প্রিন্স ফয়সালের পাশে থাকবেন প্রিন্স কুমার। 'হয় ভয় পেয়েছেন, নয়তো বিপদ থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে সরকারী চাপ আছে। কেবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তিনি।'

'সরকারী চাপ থাকা সম্ভব,' বলল সোহেল। 'সরকার ভয় করছে, হামলা হতে পারে।'

'আমরা ওদের চেয়ে বেশি খবর রাখি। রাইফেল ডেলিভারি দিতে দেখেছি আমি। গান-পোস্টটা আবিষ্কার করেছি। স্নাইপারের ছবি পর্যন্ত তুলেছি। ভয় করছি না, আমরা জানি।'

'আমি ভাবছি, ভয় পেয়ে ওরা যদি শেষ মুহূর্তে প্রোগ্রাম অদলবদল করে তাহলেই বিপদ।'

'প্রোগ্রাম সম্পর্কেই আমরা কিছু জানি না, অদলবদলের কথা এখুনি আসছে কেন?'

'জানি, রানা।'

'হোয়াট?'

'শোভাযাত্রা লিঙ্ক রোড ধরেই যাবে।'

'ভেরি গুড!' দুশ্চিন্তামুক্ত হলো রানা। সেট-আপটা কাজ করবে। 'খবরটা জোগাড় করলি কিভাবে, সোহেল?'

'আবদুল্লা দিয়েছে। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ও। গোটা রুটটাই পেয়েছি ওর কাছ থেকে।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। বলল, টোটার সেলে আরও একজন লোক ঢুকেছে।'

'সাতজন হলো।' বলল রানা। ব্যাপারটা নিয়ে আরও একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ছিল ওর। কিন্তু হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠায় তাৎপর্যটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। 'বিনিময়ে কিছু চাইল আবদুল্লা?'

'না। সে নাকি ঋণ শোধ করছে।'

রানা ভাবল, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নয় তো?

'আবদুল্লা অনুরোধ করেছে, আমরা যেন তার সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখি, কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে জানাতে পারবে।'

'বেশ তো। কিন্তু পথ দেখিয়ে আমার কাছে আনবি না। গতবার ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি ফেউ লেগেছে। খসাতে বেশ সময় লেগেছিল। শুঁয়োপোকার খবর কি? সাবধান করে দিয়েছিস তো?'

'সেদিন বাইরে বেরিয়ে তাকে আমি পাইনি।'

'না পাবারই কথা,' বলল রানা। 'আমরা অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় আবার দেখা করব, এই আশায় তোকে ফলো করেছিল আবার।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার গেল সোহেল। 'দূতাবাসের কাছাকাছি গিয়ে সেটা টের পাই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর শান্তভাবে বলল, 'তুই জানিস, অকারণ রহস্য আমি পছন্দ করি না। এই মেয়েটা আর তুই যা করছিস...'

'আমি তো তোকে বলেই দিয়েছি, বড় সাহেবের হুকুম, এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাবি না।'

'ওরা কি আমাকে টোটার হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছে?' রানা যেন সোহেলের কথা শুনতেই পায়নি।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'টোটার তরফ থেকে তোর কোন বিপদের ভয় নেই। তুই-ই টোটার জন্যে একটা বিপদ।'

'তাহলে? কার কাছ থেকে রক্ষা করতে চাইছে?'

'শিডিউল সম্পর্কে জানতে চাস?' এবার সোহেল যেন রানার কথা শুনতে পায়নি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। জানে, সোহেলের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। 'বল।'

'শিডিউলের কোন পরিবর্তন করা হয়নি,' বলল সোহেল। 'কাল এগারোটা পঞ্চাশে ব্যাংককে আসছেন প্রিন্স কমহাদ। রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটা প্লেন তাঁকে নিয়ে আসবে। প্লেনের ক্যাপ্টেন থাকবে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন আবদুল কাদির। প্লেনে আরও থাকবে, উইং কমান্ডার সাদ মুস্তাকিম, রিয়ার অ্যাডমিরাল ফারুক ইয়াজদানী, সুপারিনটেনডেন্ট খালিদ এবং ইন্সপেক্টর

তারেক।'

'এয়ারপোর্টে কে কে থাকবেন?'

'প্রিন্সকে অভ্যর্থনা জানাবেন হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স লিমুই নিয়তি। ইনি থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রীও। থাকবেন মার্শাল কমালি বিত্তার, ব্যাংককের গভর্নর। জেনারেল থোরাপান, এয়ারমার্শাল গোয়ানোচারা, অ্যাডমিরাল তরুকেন এবং সৈয়দ ওয়ালিহুর রহমান, থাইল্যান্ডে সউদী রাষ্ট্রদূত। আর যারা উপস্থিত থাকবেন...'

'তুই থাকবি?'

'অবশ্যই।'

'প্রথম ওখান থেকেই কি আমার সাথে রেডিও যোগাযোগ করবি তুই?'

আগেই ঠিক হয়েছে, দু'মুখো একটা রেডিও ব্যবহার করবে ওরা। কোন কারণে যদি রেডিও কাজ না করে বা ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, লামপিনি পার্ক থেকে ঘুড়ি ওড়ানো হবে।

'না,' বলল সোহেল। 'বারোটা পাঁচে এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হবেন প্রিন্স, রাজপ্রাসাদে পৌঁছুবেন একটায়। ওখান থেকে যোগাযোগ করব আমি। লাঞ্চের পর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন তিনি, সউদী দূতাবাসে পৌঁছুবেন সোয়া তিনটের দিকে। কর্মচারীদের সাথে কথা বলার জন্যে পনেরো মিনিট সময় নেবেন। তিনটে চল্লিশে দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসবেন। লামপিনি পার্ক হয়ে রামাফোরে যাবেন, ডান দিকে বাঁক নিয়ে আসবেন লিঙ্ক রোডে।'

'মাঝখানে আর কোথাও থামাথামি নেই?'

'না। তিনটে পঞ্চাশ বা কাছাকাছি সময়ে লিঙ্ক রোডে পৌঁছুবে শোভাযাত্রা।'

চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকবে। সূর্যটা কোথায় থাকবে আন্দাজ করল রানা। ওই সময়ে রোদ কোন সমস্যা হবে না। যানবাহন চলাচল আগে থেকেই বন্ধ করে দেয়া হবে, কাজেই ধুলোর সমস্যাও থাকছে না। হাতঘড়ি দেখল ও। 'মন্দ নয়। এখন থেকে পনেরো ঘন্টা পর। আর শুধু একটা প্রশ্ন: এসব ব্যাপারে প্রিন্সের প্রতিক্রিয়া কিছু জানতে পেরেছিস?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'তাঁকে নিয়ে বিপদেই পড়ে গেছে ওরা। গাড়িতে কোন শিল্ড রাখতে রাজি করানো যায়নি তাঁকে।'

'রিয়ার প্লাস্টিক কোয়ার্টার-লাইট?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, সামনে পিছনে কোথাও কোন শিল্ড থাকতে পারবে না।'

অথচ ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছনে শিল্ড থাকলে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পাবে না টোটা। প্রথমবার ব্যর্থ হলে পিছন থেকে আরেকবার চেষ্টা করবে সে।

'তার এই জেদ না মানলেই হয়।'

'লন্ডনে কি ঘটেছিল জানলে এ-কথা বলতি না,' বলল সোহেল। 'হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে গাড়িতে ওঠার সময় দেখেন, তাঁর কথা রাখা হয়নি, গাড়িতে

শিশু রয়েছে। কাউকে কিছু না বলে প্লেনের দিকে হাঁটা ধরেন তিনি। ব্রিটিশ মন্ত্রীরা তাঁর হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু ওই গাড়িতে আর চড়ানো সম্ভব হয়নি।'

'জানি,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা, 'ভারি জেদী লোক। ভয়-ডরও নেই।'

'আর কিছু জানার আছে তোর?'

'না।'

দিনটা এগোল ঢিমেতালে। সকালের দিকে প্রথম কয়েক ঘণ্টা লিঙ্ক রোডটাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দেখাল। অন্যান্য দিনের সাথে পার্থক্য শুধু এই যে আজ ছুটির দিন, যানবাহনের তেমন ভিড় নেই, ফুটপাথ ধরে লোকজন অলসভঙ্গিতে হাঁটা-চলা করছে।

বেলা এগারোটায় ট্র্যানজিস্টরে খবর শুনল রানা। প্রিন্স কুমারের অসুস্থতা সম্পর্কে বলা হলো, রাতটা তিনি ভালই কাটিয়েছেন, তবে ধারণা করা হচ্ছে দিনকয়েক শয্যাশায়ী থাকতে হবে তাঁকে। রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, সম্মানীয় মেহমানের পাশে তাঁর বদলে থাকবেন হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স সুখেন, তিনি প্রিন্স ফরহাদের সফর উপলক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

এই প্রথম জনসাধারণকে বিস্তারিত জানানো হলো, শোভাযাত্রা কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যাবে, কোথায় যাত্রা-বিরতি করবে ইত্যাদি। সোহেলকে দেয়া উত্তম আবদুল্লার তথ্যে কোন ভুল পেল না রানা।

আধঘণ্টার মধ্যে বাতিল বিল্ডিঙের নিচের ফুটপাথ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল। একটু পরই এল পুলিস, রাস্তার দু'ধারে রশি টাঙাল তারা—দুই রশির মাঝখানের রাস্তায় দর্শকরা যাতে না ঢোকে। এরপর এল মোটরসাইকেল পেট্রল, ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে গলদঘর্ম হয়ে উঠল তারা।

বাতিল বিল্ডিং আর মন্দিরের মাঝামাঝি দূরত্বে, লিঙ্ক রোড বুমেরাং আকৃতি নিয়ে বেঁকে গেছে, ঠিক বাঁকটার কাছেই বেশি ভিড় করেছে দর্শকরা, কারণ ওখান থেকেই সবচেয়ে ভালভাবে শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যাবে।

রাস্তাটাকে আজ সুন্দরী বলা যায়। পতাকা, ফেস্টুন, ফুল, তোরণ, ব্যানার, রঙচঙে সিল্ক পরা মেয়ে ইত্যাদি মিলে অপরূপ হয়ে উঠেছে তার চেহারা। বেলা দুটোর কিছু পর থেকে যানবাহনের স্রোতটাকে রামাফোরের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো, জন সমুদ্রের কোলাহল ছাড়া সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে পড়ল লিঙ্ক রোড। সমুদ্রের মাঝখানে উজ্জ্বল হলুদ একটা দ্বীপের মত লাগল একদল পুরোহিতকে। রোদ এখনও খুব গরম, তার ওপর প্রচণ্ড ভিড়, দর্শকদের গলা শুকিয়ে কাঠ। ফুটপাথের ধারে দোকান খুলে বসেছে হকাররা, বরফ দেয়া পানি বিক্রির ধুম পড়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাপ-চাচার ঘাড়ে চেপে ফুঁ দিচ্ছে রঙিন বাঁশিতে। গম্ভীর চেহারা নিয়ে টহল দিচ্ছে পুলিস, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু করছে তারা। মাঝেমধ্যে কোন যুবক বা

কোন বয়স্কা মহিলার হাত থেকে ফুলের তোড়া চেয়ে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করছে, ফিরিয়ে দিচ্ছে আবার।

টাঙানো রশির পাশে, খানিক পরপর থাই রেডক্রসের ফার্স্ট-এইড বাহিনীর লোকজন পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিল্ডিঙের নিচের একটা দরজা খুলে গেল। এই আওয়াজটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা। ঘর থেকে বেরিয়ে এলিভেটরের কাছে চলে এল ও। পাশেই সিঁড়ি, নিচ থেকে লোকজনের গলা উঠে এল। আরও দরজা খোলার আওয়াজ পেল ও। তিনতলার কামরাগুলো চেক করতে শুরু করেছে পুলিস। এলিভেটরে ঢুকল রানা। বিল্ডিঙে ইলেকট্রিসিটি নেই, এটাকে ফেলে দেয়া হবে বলে লাইন কেটে ফেলা হয়েছে। ম্যানুয়াল ইমার্জেন্সী হ্যান্ডেলটা আগেই পরীক্ষা করে রেখেছে, সেটা ধরে ঘোরাতে শুরু করল ও। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল এলিভেটর।

পাঁচ আর ছয়তলার মাঝখানে, নিরেট দেয়ালের সামনে থামল এলিভেটর। নিজের বলতে যা কিছু আছে, ছয়তলা থেকে সব সাথে করে নিয়ে এসেছে রানা। ঘরটা এখন সম্পূর্ণ খালি, সার্চ করে কিছুই পাবে না পুলিস। কার্পেট, স্লিপিং ব্যাগ, তেপায়া, ক্যামেরা, ফিল্ড-গ্লাস, রাইফেল—এলিভেটরটাকে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসের দোকান মনে হচ্ছে এখন।

বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সিঁড়িতে ভারী বুটের আওয়াজ শুনল ও। এক এক করে সব ক'টা ঘরের দরজা খুলছে পুলিস। পরস্পরের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। সবশেষে টপ ফ্লোরে পৌঁছুল ওরা।

ছয়তলাতেই সবচেয়ে বেশি সময় নিল ওরা। বাতাস নেই, ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, হাতে কোন কাজ নেই, আজেবাজে চিন্তা ঢুঁ মারতে লাগল মাথায়। পুলিস চলে গেলে হাতল ঘুরিয়ে আবার ছয়তলায় উঠে যেতে হবে ওকে, কিন্তু তখন যদি হাতলটা কাজ না করে?

হাতঘড়ি দেখল রানা। শিডিউল যদি ঠিক থাকে, দশ মিনিট পর যোগাযোগ করবে সোহেল। এখুনি সোহেল যাতে সিগন্যাল পাঠাতে না পারে, টু-ওয়ে রেডিওটা অফ করা আছে কিনা তা আরেকবার দেখে নিল রানা।

লক্ষণ খারাপ! একই জিনিস দু'বার চেক করা মানে আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটেছে।

রাইফেলের মেকানিজম থেকে তেলের গন্ধ ঢুকল নাকে। একটা আওয়াজ হলো। রানার ওপরে, ছয়তলায়, লোহার দরজা খুলে কেউ দেখল এলিভেটরের ছাদে লোক-টোক আছে কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল সে। কাজে কোন ফাঁকি দিচ্ছে না ওরা, মনে মনে স্বীকার করল রানা। ওর কাজেও কোথাও কোন ফাঁকি পাবে না কেউ।

গ্রাউন্ড লেভেলে, এলিভেটরওয়েলে রয়েছে মেইন ইমার্জেন্সী হ্যান্ডেল, ওখান থেকে সেটা ঘুরিয়ে যে-কেউ এলিভেটর নিচে নামাতে বা ওপরে ওঠাতে পারে। স্ক্রু খুলে হাতলটাকে সরিয়ে রেখেছে ও।

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা। সার্চ শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে পুলিসের দলটা। সোহেলেরও যোগাযোগ করার সময় হয়েছে। ওদের পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর হাতল ঘোরাতে শুরু করল।

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল রানা। দরজার মাথা থেকে একটু ওপরে আগেই একটা পেরেক পুঁতে রেখেছিল, কার্পেটটা তাতে আটকে দিল। গুলির আওয়াজ ভেতরেই থেকে যাবে।

সার্চ শেষ করে বিল্ডিঙের নিচের মেইন দরজা বন্ধ করে রেখে গেছে পুলিস। গুলির আওয়াজ নিচে পর্যন্ত যদি যায়ও, বাইরে বেরোতে পারবে না। আওয়াজের বেশির ভাগটাই আটকা থাকবে এই ঘরের ভেতর, কারণ রাইফেলটা বসানো হয়েছে জানালা থেকে অনেকটা দূরে। আর শব্দ যদি বাইরে বেরোয়ও, রাস্তা থেকে ঘরটা উঁচুতে হওয়ায় শব্দের উৎস আন্দাজ করা সহজ হবে না।

দিনের এই অংশে মন্দিরের গরাদহীন মাঝখানের জানালায় এই প্রথম নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। সাইটে চোখ রেখে আধঘণ্টায় বার তিনেক দেখল রানা তাকে। অনড় অবস্থায় মাত্র একবার পাওয়া গেল লোকটাকে, তিন সেকেন্ডের জন্যে। তার মাথা আর মুখটাকে টার্গেট হিসেবে বেছে নিল ও। স্কোপের ক্রস-হেয়ার পয়েন্ট টার্গেটের মধ্যে স্থির রাখতে কোনই অসুবিধে হলো না।

সময় হলে ওরই মত শত্রুও অনড় অবস্থায় থাকবে।

বেলা একটায় প্রথম যোগাযোগ করল সোহেল। এই মুহূর্তটি থেকে গোটা অপারেশন যেন জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে উঠল। এই মিশনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য যেন এই প্রথম উপলব্ধি করল রানা।

রেডিওতে সোহেলের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'রাজপ্রাসাদে পৌঁচেছেন প্রিন্স ফরহাদ।'

ট্রানজিস্টর আর টু-ওয়ে রেডিও থেকে এক এক করে খবর আসতে লাগল।

ডন মুয়াং এয়ারপোর্টে নিরাপদেই পৌঁচেছেন প্রিন্স ফরহাদ। অত্যন্ত প্রাণ-চঞ্চল আর হাসিখুশি দেখা গেছে তাঁকে। বলেছেন, এত ফুলের সমারোহ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এয়ারপোর্টের বাইরে সেই সকাল থেকে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল জন-সমুদ্র, প্রিন্সকে দেখে মহা উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা। পুলিস বাহিনী সদলবলে উপস্থিত ছিল, অত্যন্ত সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করেছে তারা। কোথাও কোন রকম গোলযোগ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। এখন নিশ্চিতভাবে জানা গেছে, সুপারিনটেনডেন্ট বাদিল আর ইন্সপেক্টর তাকেক প্রিন্সের সাথে এসেছেন। সরকারী অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স

সুখেন, তার মানে শোভাযাত্রার সময় সম্মানীয় মেহমানের পাশের আসনটা তিনিই দখল করবেন। শোভাযাত্রা সম্পর্কে সরকারী ভাবে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। মিছিলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ব্যাংকক মেট্রোপলিটন পুলিসের দশজন মোটরসাইকেল আরোহী। ফ্ল্যাগ কারে থাকবেন প্রিন্স ফরহাদ, প্রিন্স সুখেন, সউদী রাষ্ট্রদূত, সউদী দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং থাই রাজ-পরিবারের দু'জন দেহরক্ষী। দ্বিতীয় আর তৃতীয় গাড়িতে থাকবেন মন্ত্রীসভার সদস্য, বন্ধু দেশের রাষ্ট্রদূত আর নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসাররা। মোটর শোভাযাত্রার মাঝখানটায়, দু'পাশে থাকবে বারোজন মোটরসাইকেল আউটরাইডার। পিছনে থাকবে পনেরো জন মোটরসাইকেল পুলিস। অফিসারদের সবার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে।

তিনটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকি, সোহেলের রেডিও মেসেজ এল, 'শোভাযাত্রা এইমাত্র রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেল,' তার গলায় চাপা উত্তেজনা। 'রাজদামনোয়েন সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দিকে যাচ্ছে এখন।'

এরপর আবার যখন ক্রির ক্রির করে উঠল রেডিও, জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখছিল রানা। রেডিওর কাছে ফিরে এসে মেসেজ রিসিভ করার জন্যে সুইচ অন করল ও।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস, রানা?'

'বল,' বলল রানা। বুঝতে পারল, সোহেল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সাড়া পেতে দেরি হওয়ায় নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিল, রেডিও খারাপ হয়ে গেছে।

'তোর ওদিকে সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যাঁ।'

'পুলিস কি সার্চ করে...'

'এখন নাকি! সে-ঝামেলা বারোটার দিকেই চুকে গেছে।'

অপর প্রান্তে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা, তারপর আগের চেয়ে শান্ত সুরে বলল সোহেল, 'গভর্নমেন্ট হাউসে পাঁচ মিনিটের যাত্রা-বিরতি। এরপর থামবে দূতাবাসে।'

'ঠিক আছে,' বলে স্ট্যান্ড বাই সুইচ অন করে রাখল রানা।

নিচের রাস্তা থেকে জনতার ভারী কোলাহল ভেসে আসছে। যানবাহনের কোন আওয়াজ নেই। জানালার কাছ থেকে দূরে সরে থাকল রানা।

সাইটে চোখ রাখল ও। স্কোপের একেবারে সামনে চলে এল মন্দিরের গরাদহীন জানালা। সাথে সাথেই নড়াচড়া দেখল ও। এখনও স্মোকড গ্লাস পরে আছে সে। চশমা খোলা অবস্থায় একবারও তাকে দেখেনি ও। ভাবল, এই মুহূর্তে কি ভাবছে টোটা?

প্রথম গুলিটাই গুরুত্বপূর্ণ। সময় নিয়ে, যত্নের সাথে করা হয়। দ্বিতীয় এমন কি তৃতীয়বারও গুলি করার সুযোগ অনেক সময় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথমবারের মত সময় আর যত্ন নেয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া প্রথমবার ব্যর্থ হলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, স্নাইপার ধরেই নেয় এরপরও ব্যর্থ হবে সে।

কিন্তু রানা জানে, প্রথমবারেই সফল হবে টোটা, দি মঙ্গোলিয়ান।

তার মানে, গুলি করার কোন সুযোগই টোটাকে দেয়া চলবে না। শেষদিকে খুব জোর দশ সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে, এই দশ সেকেন্ডের মধ্যে তৎপর হবে ওরা দু'জন।

কির কির আওয়াজ শুনে সুইচ অন করল রানা।

'শুনতে পাচ্ছিস, রানা?'

'বল।'

'শোভাযাত্রা দূতাবাসে পৌঁচেছে। পনেরো মিনিট থাকবে। এখন থেকে দশ মিনিট পর, ঠিক তিনটে পঁয়ত্রিশে, সেট অন করে রাখবি। রাখবি কিনা জানা।'

'তিনটে পঁয়ত্রিশে। রাখব।'

সুইচ অফ করে দিল রানা। ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল এক সেকেন্ড। সোহেলের গলার সুর ভাল ঠেকেনি ওর। নিজেকে শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও, তার মুখের প্রতিটি শব্দের সাথে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে আতঙ্কের সুর। এমন তো ছিল না ও, এই ব্যাপারটায় এতটা ঘাবড়ে গেল কেন সোহেল? ভেতরে আরও কোন ব্যাপার আছে—কিন্তু কি সেটা?

দশ সেকেন্ড! মাত্র দশ সেকেন্ড! পুলিস আউটরাইডারদের ভ্যানগার্ড লিঙ্ক রোডে ঢুকছে, সময়টা শুরু হবে তখন থেকে। শেষ হবে মোটর শোভাযাত্রার সামনের গাড়িটা মন্দিরের বাগানের আড়ালে চলে যাবার সাথে সাথে। এক হিসেবে এই সময়ের অর্ধেকটা পাওয়া যাবে। টোটা রাইফেল না তোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও।

জনতার কোলাহল অস্থির করে তুলল রানাকে। জানালার সামনে গিয়ে নিচে তাকাতে ইচ্ছে হলো। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, আরেকবার দেখে নিলে ভাল হত। কিন্তু এখন জানালার সামনে যাওয়া নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে।

ঘরের ভেতরটা যেন আগুন হয়ে আছে। রুমাল দিয়ে বার বার হাতের ঘাম মুছল রানা। জানালার কাছ থেকে এতটা পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু মন্দিরের বিশাল গম্বুজটা দেখতে পাচ্ছে ও, বিকেলের আকাশে ঝলমল করছে। আর দেখতে পেল গরাদহীন জানালাগুলো।

ঠিক তিনটে পঁয়ত্রিশে যোগাযোগ করল সোহেল। 'শুনতে পাচ্ছিস, রানা?'

'বল।'

আস্তে আস্তে কথা বলল সোহেল, 'প্রিন্স ফরহাদ গাড়িতে উঠছেন। তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছেন প্রিন্স সুলেমান।'

রেডিও থেকে দর্শকদের উল্লাস-ধ্বনি বেরিয়ে আসছে।

'এখন গাড়িতে চড়ছেন শেখ রাইদুত।' তারপর শোনা গেল গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। থাই ড্রাইভার কে যেন কি বলল।

'মোটর শোভাযাত্রা রওনা হলো আবার।'

তিনটে বেজে একচল্লিশ মিনিট।

'ঠিক আছে, সোহেল,' বলল রানা। 'এখন থেকে আমার দায়িত্ব।'

কি যেন বলতে শুরু করল সোহেল, কিন্তু সুইচ অফ করে দিল রানা।

আট কিংবা নয় মিনিট আছে। স্পীড হবে প্রতি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বা কাছাকাছি। কল্পনার চোখে মোটর শোভাযাত্রাটাকে আসতে দেখল রানা। প্লার্ন চিং রোডের শেষ মাথায় পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল, ঢুকল বিদায়ু রোডে। ব্রিটিশ দূতাবাসকে পাশ কাটাচ্ছে। রাস্তার ধারে কোলাহলমুখর মানুষের ভিড়। এরপর স্প্যানিশ দূতাবাস। তোরণ। চারদিকে করতালি। ফুল, ফুলের মালা। জাপানী দূতাবাস। বড়দের কাঁধে চড়ে মেহমানকে একনজর দেখে নিচ্ছে শিশুরা। এরপর নেদারল্যান্ডের দূতাবাস। একজন দর্শক অজ্ঞান হয়ে গেছে, ফার্স্ট-এইড কর্মীরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত। মার্কিন দূতাবাস। বরফ দেয়া পানি গ্লাসে ভরে বিক্রি করছে হকাররা। লামপিনি পার্ক।

ঘরের একধারে চলে এসেছে রানা, পার্কের ওপর নীল ক্রস আঁকা হলুদ ঘুড়িটাকে উড়তে দেখল, ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে খেতে আকাশের আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে।

হাতের ঘাম মুছে ভিজে গেছে রুমালটা। আর তিন মিনিট, খুব বেশি হলে চার। বিল্ডিঙের নিচে লিঙ্ক রোডের খানিকটা অংশ দেখতে পেল। একটা অ্যাম্বুলেন্স সাইড রোড ধরে ধীর, অলস ভঙ্গিতে পিছু হটছে। লোকজনের ঠিক পিছনে পৌঁছে থামল সেটা। একজন লোককে দেখা গেল, গ্যাস বেলুন বিক্রি করছে।

হঠাৎ উথলে উঠল ভিড়। একটানা গর্জনের মত শোনাল হাজার হাজার মানুষের কোলাহল। তারপর হঠাৎ করেই শান্ত হলো ভিড়, আওয়াজটাও ঝিমিয়ে পড়ল। কিছু না, ভুল হয়েছিল দেখতে। পুলিস কারের ছাদকে শোভাযাত্রার ভ্যানগার্ড মনে করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সবাই।

আর মিনিটখানেক।

এবারের মিশনটাকে বড় বেশি লম্বা মনে হয়েছে। টয়োটার মধ্যে দিন কাটানো, জুপিটারের সাথে বসবাস, টোটাকে ভাল করে চেনা। আওয়াজটা এল অনেক দূর থেকে। হাততালির শব্দ। প্রথম দিকে অস্পষ্ট, ধীরে ধীরে জোরাল হয়ে উঠল। রাইফেলের পিছনে চলে এল রানা। শেষবার হাতের ঘাম মুছল। কব্জি, তালু, আঙুলের ফাঁক, বিশেষ করে ডান হাতের আঙুলের ফাঁকগুলো।

লিঙ্ক রোডের দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। স্কোপের ক্রস-হেয়ার গরাদহীন জানালার মাঝখানে, লোকটার চোয়ালের ওপর সেন্টার করল রানা।

রাইফেল তুলল লোকটা। লম্বা চকচকে ব্যারেলটা দেখতে পেল রানা। লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়াতে শুরু করল ও। কানের বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে যেন সাইটে চোখ রেখে এখনও টার্গেট দেখছে ও। খুশি হয়ে উঠতে গিয়েও হঠাৎ উপলব্ধি করল ও, লোকটার মুখে। সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে।

নিচ থেকে যে আওয়াজটা ভেসে এল সেটা উল্লাসের নয়, আতঙ্কের। বুকের ভেতর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কেউ বলে না দিলেও জানে, সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে। ঠেকাতে পারেনি ও।

ছয়

ঘরে বারুদের তীব্র গন্ধ। বিস্ফোরণের ধাক্কায় এখনও ঝাঁ ঝাঁ করছে রানার মাথা। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই নড়ে উঠল ও। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে তাকাল। এখনও চিৎকার করছে লোকজন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে ওরা হাততালি দিচ্ছিল, ফেটে পড়ছিল উল্লাসে, অথচ এখন তারা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি আর বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তনাদ করছে।

নিচে তাকিয়ে প্রথমে যা দেখল, কিছুই বোধগম্য হলো না রানার। তারপর, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল কি ঘটেছে। ভ্যানগার্ড এসকর্ট যথারীতি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রী বাঁক নিয়েছিল, কিন্তু রয়্যাল কার বাঁকের মুখে পৌঁছেও বাঁক না ঘুরে সোজা এগিয়ে যায়, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দিয়ে তৈরি রক্ত-মাংসের পাঁচিলটাকে। গাড়িটা থামার আগেই বহু লোক ধরাশায়ী হয়েছে। ক'জন মারা গেছে, ক'জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে বলা কঠিন।

এলোমেলো বাতাস লাগা ধানখেতের মত জন-সমুদ্র একবার এদিক একবার ওদিক কাত হয়ে পড়ছে, তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদা ক্যাডিলাক। ভ্যানগার্ড এসকর্ট খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এখন সেটা পিছু হটে ফিরে আসছে। শোভাযাত্রার ডানদিকে মোটরসাইকেল আরোহী কয়েকজন পুলিস ব্রেক কষে যার যার মোটরসাইকেল দাঁড় করাচ্ছে। এদের কয়েকজন ক্যাডিলাককে বিপথে এগোতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে তারা তাদের মোটরসাইকেল রাস্তার ওপর ফেলে লাফ দিয়ে সরে গিয়েছিল একপাশে। রাস্তার ওপর বেশ খানিকটা পেট্রল পড়েছিল, কংক্রিটের সাথে ধাতুর ঘষায়, আগুনের ফুলকি ওঠে—আগুনটা দ্রুত বড় হয়ে উঠছে। একটা পেট্রল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলো। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছিল একজন আউটরাইডার, তার ইউনিফর্মে আগুন ধরে যাওয়ায় পাগলের মত রাস্তার ওপর গড়াগড়ি খেতে শুরু করল সে।

ডানদিকের মোটরসাইকেল আরোহীরা সবাই এখনও ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে পারেনি, কেউ কেউ নিজেদের বাহন ঘুরিয়ে নিয়ে অকুস্থলের দিকে ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে দুটো মোটরসাইকেল পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল।

ভিড়ের মাঝখানে এরই মধ্যে একটা গলি তৈরি করে নিয়েছে স্ট্রেচার বেয়ারারা, বাঁকের কাছ থেকে সেই গলি ধরে পিছু হটে এগিয়ে আসছে অ্যাম্বুলেন্স, হাঁ হাঁ করছে দুটো দরজাই।

রানার পাশে, মেঝেতে কির কির, কির কির করছে রেডিওটা। গ্রাহ্য করল না ও। সোহেলকে বলার মত কিছু নেই ওর।

আগুন নেভাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে পুলিসের লোকজন। উল্টে পড়া মোটরসাইকেলগুলো টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল তারা, তা না হলে আরও পেট্রল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হত। কয়েকজন আউটরাইডার তাদের বাহন নিয়ে বারবার ভিড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য লোকজনকে আগুনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কিন্তু লোকজনের কোন উপায় নেই, নিজেদের তৈরি ভিড়টাই তাদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। মন্ত্রী আর তাঁদের সেক্রেটারিরা গাড়ি থেকে নেমে পুলিসকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন। খবর পেয়ে ছুটে আসছে দমকল বাহিনী, মন্দিরের অনেকটা সামনে থেকে অস্পষ্ট সাইরেনের শব্দ ভেসে এল।

কিন্তু রয়্যাল কারের চারপাশে কি ঘটছে তা এমনকি ছয়তলার ওপর থেকেও দেখতে পেল না রানা। কাতর, অস্থির, প্রজাপতির মত চঞ্চল অসংখ্য লোকের আড়ালে ঢাকা পড়ে রয়েছে ক্যাডিলাক।

গোটা দৃশ্যের ওপর বিকেলের রোদ পড়েছে—ফুল, পতাকা, তোরণ, সিল্ক পরা মেয়ে সবকিছু বড় বেশি উজ্জ্বল ও বেমানান। জন-সমুদ্র থেকে এখনও উঠে আসছে আর্তনাদ।

ফিল্ড গ্লাসটা এলিভেটরে রেখে এসেছিল রানা, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে এল সেটা। লেন্সের মাঝখানে ক্যাডিলাক গাড়িটাকে রাখল ও।

একটানা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সোহেল।

দমকল এসে নিভিয়ে ফেলেছে আগুন। হলুদ কাপড় পরা পুরোহিতরা সাহায্য করছে পুলিসকে। রয়্যাল কারের ভেতর এখনও দু'জন লোক রয়েছে। সামনের আসনে বসে রয়েছে ড্রাইভার, কিন্তু নড়াচড়া নেই। অপর লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে পিছন দিকে। চোখে ফিল্ড গ্লাস থাকলেও সাদা ড্রেস পরা প্রিন্স সুখেনকে খুঁজে পেল না রানা, কারণ পুলিসদের ইউনিফর্মও ওই একই রঙের—সাদা।

চারদিকে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। টাঙানো রশির কোন অস্তিত্বই নেই। রাস্তা আর ফুটপাথ, দুটোকে আলাদাভাবে চেনার এখন আর কোন উপায় নেই, হাজার হাজার কালো মাথায় ঢাকা পড়ে গেছে সব। দু'একটা গলি পরিষ্কার রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিস, আহতদের ওই পথেই নিয়ে যাওয়া হবে। থাই রেডক্রসের কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স এরই মধ্যে পথ করে নিয়ে ঢুকে পড়েছে একটা গলির ভেতর।

মানুষের আতঙ্কিত চিৎকার স্তিমিত হয়ে এল।

রেডিওটা তুলে নিয়ে সুইচ অন করল রানা। 'সোহেল?'

'কি ঘটেছে? কোথায় ছিলি তুই? সাইরেনের শব্দ পাচ্ছি কেন?' আরও অনেক প্রশ্ন করত সোহেল, কিন্তু দম ফুরিয়ে যাওয়ায় থামল।

শান্তসুরে বলল রানা, 'রাস্তা থেকে সরে গিয়ে লোকজনের ঘাড়ে পড়েছে গাড়ি।'

ঠিক কি বলল সোহেল, পরিষ্কার ধরতে পারল না রানা। গড বা ওই ধরনের কিছু। 'পেট্রলে আগুন ধরে গিয়েছিল, কিন্তু নিভিয়ে ফেলা হয়েছে,' বলে চলল রানা, 'অনেক লোক আহত হয়েছে, মারাও গেছে···ক'জন জানি না। একেবারে সরাসরি গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে গাড়িটা। কাছাকাছি একটা অ্যাম্বুলেন্স ছিল, এইমাত্র রওনা হয়ে গেল। এখান থেকে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'টোটা?' জানতে চাইল সোহেল।

'মারা গেছে।'

বাতাসে এখনও বারুদের গন্ধ।

পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু অপরপ্রান্তে চুপ করে থাকল সোহেল। প্রশ্নটা করার জন্যে সাহসের দরকার। সরাসরি নয়, কথাটা ঘুরিয়ে জানতে চাইল সে, 'রানা?'

'বল।'

'তুই যেখানে রয়েছিস সেখান থেকে প্রিন্স ফরহাদকে দেখা যাচ্ছে?'

'না।'

আবার অল্প কিছুক্ষণের বিরতি। 'আমি লিঙ্ক রোডে আসছি,' অবশেষে বলল সোহেল। 'পরে যোগাযোগ হবে।'

ইচ্ছে করলে ছয়তলার ওই ঘরের ভেতর আরও অনেকক্ষণ থাকতে পারত রানা। ব্যর্থতার জন্যে নিজেকে তিরস্কার করতে পারত, পারত শোকে কাতর হতে, কিংবা নিজের পক্ষে যুক্তি খাড়া করে ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে। যতক্ষণ খুশি ওখানে থাকলেও কেউ ওর খোঁজ পেত না। কিন্তু মিশন শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হলেও, কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর পায়নি ও। সেই উত্তর পাবার জন্যে বাতিল বিল্ডিং থেকে রাস্তায় নেমে আসতে হলো ওকে।

ঘরের ভেতর ওর যা কিছু ছিল সব এলিভেটরে লুকিয়ে রেখেছে রানা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে নিচে। চিন্তা বন্ধ রেখে পথ চলা কঠিন, শরীর নাড়া খেলে মনও নাড়া খায়। কয়েকটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। অ্যাক্সিডেন্ট নয়। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, এত ঝামেলার মধ্যে গেল কেন ওরা, কি দরকার ছিল এই জটিল আয়োজনের? সম্ভবত সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার জন্যে। বিশাল জন-সমুদ্রকে যদি কোন ভাবে অসহায় করে তোলা যায়, শুধু তাহলেই টার্গেটের কাছে পৌঁছে তাকে খুন করা সম্ভব। আটজন দেহরক্ষী আর আটত্রিশ জন সশস্ত্র পুলিস, সামনের বাধা টপকে তারা প্রিন্সের কাছে সময় মত পৌঁছুতে পারেনি। আর্ত ও আহত, মুমূর্ষুপ্রায় ও মরা মানুষ, এক একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা।

এই চিন্তার সূত্র ধরে আরেকটা প্রশ্ন এল। তাহলে কি মাস্টারকিলার টোটা নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি? ব্যর্থ হবার ভয় আগে থেকেই ছিল তার?

আরও অনেক প্রশ্ন জাগল। রানা ভাবল, মন্দিরে পৌঁছে এসব প্রশ্নের উত্তর হয়তো পেয়ে যাবে সে।

সোনালি গম্বুজ খুব বেশি দূরে নয়। লোকজনের ভিড় প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে, কারণ লিঙ্ক রোডের দুটো মুখ দিয়েই পিল পিল করে ভেতরে ঢুকছে আদম সন্তানেরা। মানুষের হৃদয়ের কাছে হিউমারের চেয়ে ট্র্যাজেডির আবেদন অনেক বেশি।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিল রানা। ছেঁড়া পতাকা ধুলোয় লুটাচ্ছে, পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে যাচ্ছে ফুল, নর্দমার কিনারায় পড়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একপাটি জুতো, হাপুস নয়নে কাঁদছে একটা বাচ্চা ছেলে, প্রার্থনা করছেন একজন পুরোহিত। রাস্তার মাঝখানে সরু একটা গলি তৈরি করে নিয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছে কয়েকটা গাড়ি। আবার সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল।

মন্দিরের গেট থেকে ঝুলছে ম্যাগনোলিয়ার মুকুল, পাতাগুলো গেটের নিচে ছায়া ফেলছে। লম্বা ফটকটা খোলা, ভেতরে কাউকে দেখা গেল না। বুদ্ধের বিশাল স্বর্ণ মূর্তির পাশেই সিঁড়িটা, ধনুকের মত বেঁকে থাকা পাঁচিল অনুসরণ করে উঠে গেছে। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ছায়ায় কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এখানে ছায়াগুলোয় ঠাণ্ডা একটা ভাব। গম্বুজের গোড়া ধরে খানিকটা এগোল ও, তারপর বাঁকানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে আরও ওপরে উঠতে শুরু করল। লোহার গ্রিলগুলো সোনালি রঙ করা, রোদ লেগে চকচক করছে।

গরাদহীন জানালাগুলো যতই কাছে চলে এল নিচে থেকে অনেক মানুষের ভারী গুঞ্জন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল কানে।

দশটা সিঁড়ির ধাপ টপকে একবার করে থামল রানা, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল মন্দিরের ভেতর কোথাও কোন শব্দ হয় কিনা। কারণ, ও জানে, টোটার কাছে তার লোকজন আসবে। এখনও কেউ জানে না দলপতি মারা গেছে।

মোট এগারোটা খালি ঘর। প্রতিটি ঘরে একটা করে গরাদহীন জানালা। ছয় নম্বর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল রানা। জানালা দিয়ে রোদ ঢুকেছে, কিছুটা পড়েছে মেঝেতে, কিছুটা লাশের মুখে। একটা গেম বুটের ব্যবহার করেছিল ও, ফলে লাশের চেহারা এখন আর চেনার কোন উপায় নেই।

রাইফেল তোলার আগে, শেষ মুহূর্তে, চোখ থেকে স্মোকড গ্লাস নামিয়ে ফেলেছিল সে। জানালার কার্নিসে অত্যন্ত যত্নের সাথে ভাঁজ করে রেখেছিল। গায়ে গ্রে রঙের জ্যাকেট আর পায়ে পালিশ করা চকচকে জুতো রয়েছে। সবই ঠিক আছে, শুধু মুখ নেই। কে জানে, এটাই হয়তো তার আসল চেহারা—রক্তাক্ত, কুৎসিত। এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল রানা, রাইফেলটা পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকল। লক্ষ করল, সোনার কাফ-লিঙ্কটা অদৃশ্য হয়েছে। আস্তিনে রয়েছে সাধারণ বোতাম। এমন কি রাইফেলটা তুলে পরীক্ষা করার আগেই বুঝতে পারল ও, কোথাও মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। কি যেন একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসছে ওর কাছে।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে গোটা ব্যাপারটা চিন্তা করার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা।

এটা সন্তাদবের রাইফেল। ছয় শটের একটা ইয়াংচো কারবাইন, রেডউড বাট।

আরও দু'সেকেন্ড পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। কিভাবে লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমেছে, বলতে পারবে না। মন্দিরের নিচে, গেটের কাছে তিনজন পুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিল। রানাকে চোর-টোর মনে করে তাদের একজন বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে এল। উপায় না দেখে তাকে এক রকম ধাক্কা দিয়েই রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা।

কাফেটা বেশি দূরে নয়। কিন্তু ভিড় ঠেলে পৌঁছুতে সময়ও কম লাগল না। কারও কাছ থেকে কোন অনুমতি না নিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল ও। এক এক করে তিনটে নম্বরে ডায়াল করল, কিন্তু সবগুলো এনগেজড। কাজেই অপেক্ষা করতে হলো।

সুযোগ পেয়ে কাজ শুরু করে দিল মাথা। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে, সব মনে করল রানা। বুঝল, গোটা মিশনটাই ছিল টোটার, ওর নয়। অথচ এই সন্দেহটা একবারও হয়নি ওর।

নিজের মিশন সম্পূর্ণ সাফল্যের সাথে শেষ করেছে টোটা।

আরও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর দূতাবাসের লাইন পাওয়া গেল।

'রুম সিক্স,' এক নিঃশ্বাসে বলল রানা, 'ফর গডস্ সেক। রুম সিক্সের লাইন দিন আমাকে।'

সাত

সোহেলের সাথে এখুনি কথা বলতে চাইল না রানা। অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবে সোহেল। সেগুলো আগে জোগাড় হোক।

টেলিফোনে রুম সিক্সকে সতর্ক করে দিয়ে কাফে থেকে নিঙ্ক রোডে বেরিয়ে এল ও। ভিড়টা ছড়িয়ে পড়লেও রাস্তা-ঘাট এখনও লোকে গিজ গিজ করছে। সবার মুখেই দুর্ঘটনার কথা। অকুস্থলের দৃশ্যটা এখন বদলে গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেছে। জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে পুলিস, একটা পানির গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘেরাওয়ের ভেতর। ক্যাডিলাকের আশপাশে রক্ত ইত্যাদি ধুয়েমুছে সাফ করার কাজে ব্যস্ত দমকল বাহিনীর লোকজন। শেষ অ্যাম্বুলেন্সটা চলে গেছে।

লোকজন বিস্ময় আর শোকের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পথ করে নিয়ে গাড়িটার দিকে এগোবার সময় অনেক মেয়েকে কাঁদতে দেখল রানা, তাদের সাথের পুরুষ সঙ্গীরা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। ঘটনাটা যারা কাছাকাছি থেকে ঘটতে দেখেছে, হয়তো কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

রিপোর্টাররা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, ছুটোছুটি করে ছবি তুলছে ফটোগ্রাফাররা।

নিঙ্ক রোডের বাঁকটা এখনও আকৃষ্ট করছে মানুষকে, বাতিল বিল্ডিঙের কাছেপিঠে একজনকেও দেখল না রানা। ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলায় উঠে এল ও।

ঘরে ঢুকে জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে সবগুলো ছবিকে জ্যামিতিক ধাঁচে সাজাতে চেষ্টা করল ও।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করাই টোটার বৈশিষ্ট্য। ও আর সোহেল জানত ব্যাপারটা। গোটা অপারেশনে গুলি করাটাই ছিল প্রধান ও মুখ্য বিষয়। কিন্তু গুলি করাটা মিশনের একটা অংশ মাত্র, সমাপ্তি নয়, সেটা ওদের জানা ছিল না। গুলি হবার পর মিশনটা এমন একদিকে মোড় নিয়েছে, মিশনের সম্পূর্ণ প্রকৃতিই তাতে করে বদলে গেছে। টোটা একজন প্রফেশনাল, অব্যর্থ গুলি করতে পারাই তার একমাত্র যোগ্যতা নয়। তার ইন্টেলিজেন্স আরও অনেক বেশি। রানার মিশন সম্পর্কে যেভাবেই হোক সব তথ্য পেয়ে গিয়েছিল সে, সেটা সামনে রেখে নিজের মিশনের ছক তৈরি করেছে। ফলে তারটা এমন এক মিশন হয়ে উঠেছিল যাতে নিজের অজান্তেই দম দেয়া একটা পুতুলের মত হাস্যকর ভূমিকা পালন করেছে রানা, যেন সরাসরি টোটার নির্দেশে, নড়াচড়া করেছে ও।

ফল যা হবার তাই হয়েছে। দিনের পর দিন গাধার খাটনি খেটে রানা পেয়েছে নগণ্য এক লোকের লাশ। আবদুল্লা বলেছিল, টোটার সেলে নতুন এক লোক ঢুকেছে। এই লাশ সেই নতুন লোকের। চেহারা চেনা যায়নি বটে; কিন্তু লোকটা যে টোটা নয় তা বোঝা গেছে লাশের আস্তিনে সোনার কাফ-লিঙ্ক নেই, টোটার ছিল। লাশের পাশে পড়ে ছিল সন্তাদবের ইয়াংচো রাইফেল, টোটার মত একজন মার্কসম্যান যা কোনদিন ব্যবহার করবে না। এত আয়োজন করে একটা টোপকে খুন করেছে ও। ওদিকে, একই সময়ে, নিজের কাজ সেরে নিয়েছে টোটা। তার যাকে মারার কথা ছিল গুলি করে ঠিকই মেরেছে তাকে।

গুদামের সামনে পৌঁছে দরজার গায়ে একটা আলপিন গাঁথা দেখল রানা। ভেতরে ঢুকে হাতের জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এল তখুনি। একটা কাফেতে ঢুকে টেলিফোন করল সুই সুক খ্রীতে—নিয়েন মনতাজকে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রাডস্টোন রেডি হয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারি না। এদিকে যদি আওয়া পড়ে, আমাদের কারখানায় একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

রিকশা না নিয়ে হাঁটবে বলে ঠিক করল রানা। গায়ে এখনও আগুন জ্বলছে, সোহেলের সাথে কথা বলার আগে সেটা যতটা সম্ভব নেভানো দরকার।

দূতাবাসের সামনে কয়েকটা গাড়ি দেখল রানা। কিন্তু রিপোর্টার আর

ফটোগ্রাফারদের ভিড় দেখে অবাকই হলো ও। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা, দু'একটা কথা কানে ঢুকল। বুঝল, প্রিন্স ফরহাদকে বাংলাদেশ ইন্টেলিজেন্স রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল, এই খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। বাধা দেয়ার আগেই রানার কয়েকটা ছবি তোলা হয়ে গেল। রানা গুরুত্বপূর্ণ কেউ হতে পারে, এই ভেবে ছবি তুলল ওরা। দুঃখ, ব্যর্থতা ও হতাশা খুব প্রচণ্ড হয়ে উঠলে অনেক সময় মানুষের কৌতুকবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অন্তত এই মুহূর্তে রানার বেলায় ঠিক তাই ঘটল। রিপোর্টাররা ওর ছবির নিচে কি ক্যাপশন লিখবে, আন্দাজ করে নিল ও—দি ম্যান হু নিউ (knew) টু লিটল।

কালচারাল অ্যাটাশের অফিসে পৌঁছুল রানা, ওর সাথে দেখা করতে এল আবার সেই মেয়েটাই।

এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, দীনাকে দেখে তা মনেই হলো না। কোন মেকআপ নেয়নি, কিন্তু চেহারাটা তাজা ফুলের মত। অ্যাশ-কালারের টাইট ফিটিং স্যুটটা পরে আছে, পকেটের সংখ্যা এত বেশি যে গুণতে শুরু করে ভয় পেয়ে থেমে গেল রানা। মেয়েটা ওকে দেখে হাসল না, কিন্তু চেহারায় উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ বা শোকের কোন ছায়াও নেই। মুখের ওপর কালো, কুৎসিত জন্মদাগটাকে ঘৃণা হলো রানার। ভাবল, ওটা না থাকলে বড় ভাল হত। হাঁটা, চাউনি, চোখ, দাঁড়াবার ভঙ্গি, হাত নাড়া, চোখের পাতা ফেলা—সবই মুগ্ধ করার মত। অথচ···

'আমার মেসেজ পাবার পর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছ তোমরা?' জানতে চাইল রানা। টেলিফোনে দীনাকে পেয়ে তাকেই সতর্ক করেছিল ও।

'ব্যাপারটা সাথে সাথে সউদী দূতাবাসকে জানিয়েছি আমরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিস ডিপার্টমেন্ট এবং থাই সিক্রেট পুলিসকেও সব বলা হয়েছে। দে আর মেকিং এ টপ প্রায়োরিটি সার্চ। শোভাযাত্রা শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল, ওটা হারিয়ে গেছে।'

রানা বুঝল, অ্যাম্বুলেন্সটার কথা বলছে দীনা। জানতে চাইল, 'ওরা কি হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে? সেনাবাহিনী ডেকেছে?'

'কিভাবে কি করবে সেটা ওদের ব্যাপার,' বলল দীনা। 'আমি শুধু ওদেরকে জানিয়েছি, ডন, এয়ারপোর্ট আর লাওস সীমান্তের দিকে যাওয়ার ল্যান্ড রোডগুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।'

'লাওস সীমান্ত?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'ওদিকে কি?'

'ওদিকে একটা জায়গা আছে, চোরাচালানীদের স্বর্গ।'

'তাতে কি?'

'ওদের ওপর মাফিয়ার প্রভাব আছে।'

রাগ হলো রানার। টিপে টিপে কথা ছাড়ছে দীনা। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল ও। আবার জানতে চাইল, 'না হয় আছে, তাতেই বা কি?'

এবার সাথে সাথে কিছু বলল না দীনা। তারপর শান্তসুরেই জিজ্ঞেস করল, 'সবকথা জানতে চান কেন?'

'আমার জানার দরকার আছে,' কঠিন সুরে বলল রানা।

'দরকার আছে কি নেই, সেটা ঠিক করবে কে?'

'তুমি তো দেখছি ভারি বেয়াদব···'

'ভেবে-চিন্তে কথা বলুন,' তীক্ষ্ণ সুরে বলল দীনা। 'আপনার হয়তো জানা নেই, আমি যে ডিপার্টমেন্টেরই হই, পদ-মর্যাদায় আপনার চেয়ে ছোট নই। কাজেই মুখটাকে একটু কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করুন।' রানা কিছু বলার আগেই আবার প্রশ্ন করল সে, 'আপনার জন্যে কি করতে পারি, বলুন। সম্ভব হলে সাহায্য করব।'

অপমানটা নিঃশব্দে হজম করল রানা। দীনা সত্যি যদি ওর সমপর্যায়ের অফিসার হয়, তার সাথে আচরণটা অন্যায় হয়ে গেছে। 'সোহেলকে সবকথা বলেছ?' তুমি বলে এসেছে, এখন আর আপনি বলা সম্ভব নয়।

'না।'

'সে কিছু বলেনি?'

'না।'

'রুম সিক্সে যেতে চাই আমি।'

'আসুন।'

দীনার পিছু পিছু করিডরে বেরিয়ে এল রানা। দূতাবাসের কয়েকজন অফিসারের সাথে রাষ্ট্রদূতকে দেখল ও। অফিসাররা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দশাসই চেহারা রাষ্ট্রদূতের, এখনও আনুষ্ঠানিক ড্রেস পরে রয়েছেন। চেহারায় ম্লান একটা ভাব। প্রায় চিৎকার করে বলছেন, 'ওদেরকে জানিয়ে দাও, এটা একটা ইমার্জেন্সী নিউজ ব্ল্যাকআউট। গেটের কাছ থেকে হটিয়ে দাও সবাইকে। সুইচবোর্ড ব্লক করো—কল শুধু বাইরে থেকে আসবে। মোহন, রাশেদকে সাথে নিয়ে এদিকে এসো।' একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি, বাকি সবাই যে যার কাজে ছুটল চারদিকে।

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল সোহেল। রানার একটা কনুই চেপে ধরল সে, ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল রুম সিক্সে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

'খোদাকে হাজারো শোকর, ওর হাত থেকে এত সহজে ছাড়া পেলাম।'

'কার কথা বলছিস?'

'শুঁয়োপোকা।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সোহেল। কোন মন্তব্য করল না। আরও কয়েক সেকেন্ড পর রানার দিকে না ফিরেই প্রশ্ন করল, 'তুই রেডি?'

রিপোর্ট চাইছে সোহেল। রানা জানতে চাইল, 'লিঙ্ক রোডে গিয়েছিলি তুই?'

'হ্যাঁ।'

'কি দেখলি?'

'কিছুরই কাছাকাছি যেতে পারিনি,' বলল সোহেল। জানালার দিকে পিছন ফিরল সে। 'তা-ই আলপিন মেসেজ পাঠিয়ে এখানে ফিরে এসে তোর

জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'তার মানে এখনও তুই কিছু জানিস না।'

'না। বল।'

'ব্যাপারটা কিডন্যাপিং।'

জানালার কাছ থেকে সরে রানার সামনে এসে দাঁড়ান সোহেল, তার চেহারা দেখে রানা বুঝল, সত্যি জানত না সে। বলল, 'তার মানে···তার মানে তুই বলতে চাইছিস, প্রিন্স ফরহাদ এখনও বেঁচে আছেন?'

'বললাম তো, ব্যাপারটা কিডন্যাপিং। ওর দিকে একবারও রাইফেল তাক করা হয়নি। খুন করেছে ওরা ড্রাইভারকে।'

এই প্রথম ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখল রানা। রোদ ঝলমলে কামরা। হাসপাতালের কেবিনের মত পরিষ্কার। সাদা রঙ করা দেয়াল। সাদা সিলিং। নীল কার্পেট। কোম্পানি মীটিং টেবিল। চেয়ার, টেলিফোন, ছাইদানী।

'আর কি জানিস তুই? সব বল আমাকে।'

'এই ব্যাপারটা জানার সাথে সাথে ওয়ার্নিং মেসেজ পাঠাই এখানে,' বলল রানা। 'ফোন রিসিভ করে দীনা। ওকে আমি একটা অ্যাম্বুলেন্সের কথা বলি। বলি, সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেয়া হোক, ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রিন্সকে।'

'অ্যাম্বুলেন্সে করে···।'

'তোকে আমি একটা সেট-আপ ব্যাখ্যা করছি—আমার নয়, টোটার। আমরা জানি, খুন-খারাবির লোক সে। কিন্তু সে তার কাজের ধরন বদলেছে। অন্তত এবার তার লক্ষ্য ছিল, কিডন্যাপিং।'

'তুই বলতে চাইছিস···'

'হ্যাঁ,' সোহেলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা, 'প্রিন্সকে আটক করার দরকার হয়েছে কারও। কেন, আমাকে জিজ্ঞেস করবি না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম টোটা তাকে গুলি করবে, ওখানেই আমাদের ভুল হয়েছে। প্ল্যান করা হয়েছিল বাঁকের কাছে খুন করা হবে ক্যাডিলাকের ড্রাইভারকে, গাড়িটা যাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে লোকজনের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ে, তাহলে প্রিন্সকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ হবে। ঘটেছেও ঠিক তাই।'

'মাই গড!'

'কিরকম গোলমাল শুরু হয়েছিল, কল্পনা কর,' বলল রানা। 'দুইটন ওজনের একটা গাড়ি ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল স্পীডে লোকজনের ভিড়ের সাথে ধাক্কা খেল। ড্রাইভারকে দেখেছি আমি, হুইলের পেছনে মরে আছে। পেছনের সীটেও একটা লাশ দেখেছি।'

'কে সে? মারা গেল কিভাবে?'

'জানি না।'

'গুলি?'

'বোধহয় না। দ্বিতীয় কোন গুলি হয়নি। টোটা একটাই গুলি করে—

দ্বিতীয়বার গুলি করলে আমি শুনতে পেতাম। প্রথম গুলির আওয়াজ শুনিনি আমি, আমার গুলির আওয়াজে সেটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। এই রকমই ঘটার কথা, কারণ নির্দিষ্ট মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অপারেট করছিলাম আমরা। আমার কানে তালা লেগে যায়, কয়েক সেকেণ্ড কিছুই শুনতে পাইনি। আর কোন গুলির আওয়াজ যদি শুনতে পেতামও, মনে হত ওটা আমারই গুলির প্রতিধ্বনি।'

'কোত্থেকে গুলি করে সে?'

'দেখ,' টেবিলে চাপড় মারল রানা, 'এখানে মন্দির। এখানে বাতিল বিল্ডিং। এদের মাঝখানে লিঙ্ক রোড। টার্গেট ছিল ড্রাইভার, কিছুক্ষণের জন্যে সেটা ভুলে থাক। ধরে নে, আগে যেমন আমরা ধরে নিয়েছিলাম, টার্গেট ছিল প্রিন্স। গাড়িটা প্রায় নাক বরাবর মন্দিরের দিকে ছুটে আসছিল, একজন মার্কসম্যানের জন্যে পজিশনটা ছিল সব দিক থেকে আদর্শ, কারণ ভিজুয়্যাল এফেক্টিভ স্পীড ছিল ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল নয়, মাত্র পাঁচ মাইল। মন্দির থেকে প্রিন্সকে গুলি করা কোন সমস্যাই ছিল না, কারণ পেছনের একটা সীটে বসেছিল সে, যে সীটটা অন্য সীটগুলোর চেয়ে নয় ইঞ্চি উঁচু। ড্রাইভারকে গুলি করা সম্ভব ছিল না, কারণ তার সামনে ছিল উইণ্ডস্ক্রীন। গুলি করা সম্ভব ছিল শুধু পিছনে বসা যে কোন লোককে—উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর দিয়ে।'

'তারমানে···'

'এ আমি জানতাম, কারণ এটা সহজ জ্যামিতি,' সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল রানা, 'ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোন প্রশ্ন তুলিনি। প্রশ্ন তুলতাম, যদি জানতাম টার্গেট প্রিন্স নয়, ড্রাইভার।'

'তারমানে এইখানে কোথাও ছিল টোটা?' টেবিলের ওপর একটা আঙুল রাখল সোহেল।

'হ্যাঁ। বাতিল বিল্ডিঙের কাছাকাছি কোথাও। ড্রাইভারকে শুধু পিছন দিক থেকে গুলি করা সম্ভব ছিল। সেই একই ডাটা—সোজা এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, পঁচিশের বদলে ভিজুয়্যাল এফেক্ট ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মাইল। এবং উইণ্ডস্ক্রীন ছিল না।'

ধীরে ধীরে পিছন ফিরে আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহেল। সম্ভবত এইটুকুই জানতে চেয়েছিল সে। বলল, 'প্রিন্স বেঁচে আছেন, সেটাই এখন বড় কথা···।'

'কিন্তু ওরা যদি প্রিন্সকে মেরে ফেলতে চাইত, আমরা ঠেকাতে পারতাম না!' অসহায় দেখাল রানাকে।

'সে-কথা ভেবে অস্থির হবার কোন মানে হয় না,' বলল সোহেল। 'পরেরবার আরও সাবধান হব আমরা। হেডকোয়ার্টার বিস্তারিত রিপোর্ট চাইবে, রানা। আরও অনেক কথা জানতে চাই আমি। লোকটা কে? মন্দিরের লোকটা?'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা। 'জানি না। সে ওই সাত নম্বর লোক। আবদুল্লা যার কথা বলেছিল। একটা টোপ।'

'টোটার অরিজিন্যাল সেলের একজন নয়?'

'না। বাছাই করা লোক ব্যবহার করে টোটা, তাদের কাউকে হারাবে না সে।'

'লোকটার পরিচয় জানতে পারলে ভাল হত…।'

'কিছু এসে যায় না,' হঠাৎ অস্থিরতা অনুভব করল রানা। 'সোহেল, কয়েকটা ব্যাপার এখনও মেলাতে পারছি না আমি।'

'বল।'

'ওরা জানত, আমি ওদের পেছনে লেগে আছি। ব্যাপারটা জেনেও না জানার ভান করেছে ওরা। আমার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করেনি। এই রহস্যের আমি কোন সমাধান পাচ্ছি না।'

চুপ করে থাকল সোহেল। কি যেন ভাবছে।

'টোটা যার হয়ে কাজ করছে তার হয়তো অর্ডার ছিল, আমাকে ঘাঁটানো চলবে না। বার বার তেল আবিবের কথা বলছে মীনা…ব্যাপারটা কি বলবি আমাকে?'

'আচ্ছা, আন্দাজ করতে পারিস, এই কাজের জন্যে কত টাকা ফি নেবে টোটা?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'দশলাখ পাউন্ডের কম নয়।'

এগিয়ে এসে রানার সামনে টেবিলে বসল সোহেল। 'অত টাকা দেয়ার ক্ষমতা শুধু একটা সরকারই রাখে।'

হাত নেড়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা। 'এর সাথে ইসরায়েল কিভাবে জড়িত হতে পারে, আমি বুঝতে অক্ষম। আমি শুধু জানি, টোটা আমাকে বোকা বানিয়েছে।'

'কি রকম?'

'যেভাবেই হোক আমার মিশনের কথা জানতে পারে ওরা,' বলল রানা। 'সেটাকে সামনে রেখে নিজেদের প্ল্যান তৈরি করে। হারিয়ে ফেলার পর টোটাকে আবার আমি খুঁজে পেলাম, সেটা আমার কৃতিত্ব নয়, টোটাই সুযোগ করে দিল আমি যাতে আবার তাকে চোখে চোখে রাখতে পারি। আমার যাতে সন্দেহ না হয়, ওরা ভান করল যেন ভয় পেয়েছে, আমাকে এড়াবারও চেষ্টা করল। আমি জানতাম কোথায় যাচ্ছে ওরা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে গোল্ড কুথটা—ওই মন্দিরে আমি তার আগেও কয়েকবার গেছি, ওখানে গিয়ে আমাকে খোঁজ-খবর করতে দেখেছে ওরা। আমি যখন…।'

'তোর অভিযোগটা গুরুতর, রানা,' বলল সোহেল। 'তোর মিশন সম্পর্কে ওরা জানল কিভাবে?'

'সেটাই তো আমার প্রশ্ন,' বলল রানা। 'উত্তরটা জানি না, কিন্তু জানব।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে বসে থাকল সোহেল। তারপর বলল, 'টোটার মিশন সম্পর্কে আর কিছু বলবি?'

'আমার ধারণা, পেছনের লোকটাকে ছুরি মেরেছে ওরা,' বলল রানা।

'পেট্রোলে আগুন ধরে গেছে, চারদিকে আহতদের চিৎকার, এই অবস্থায় কাউকে ছুরি মেরে পার পাওয়া কঠিন কিছু নয়…।'

'কিন্তু আগুন ধরার ব্যাপারটা…।'

'ওদের প্ল্যানের মধ্যে মনে হয় ওটা ছিল না,' বলল রানা। 'আগুনটা ওদের উপরি পাওনা।'

'আরও বিস্তারিত রিপোর্ট চাই আমি, রানা। তুই বলতে চাইছিস, টোটার লোকজন একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বাঁকের কাছে অপেক্ষা করছিল, দুর্ঘটনাটা ওদের তৈরি এবং হট্টগোলের মধ্যে ক্যাডিলাকের গার্ডকে ছুরি মেরে প্রিন্স ফরহাদকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেছে?'

'প্রিন্সকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার আগে হয় ঘুসি মেরে নয়তো ইঞ্জেকশন পুশ করে অজ্ঞান করে নেয় ওরা, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। নিশ্চয়ই তাকে একটা চাদর দিয়ে ঢেকেও নিয়েছিল।'

'সবটাই তোর ধারণা,' বলল সোহেল, 'কোন প্রমাণ নেই।'

'তাহলে তুই বল আর কিভাবে কাজটা করেছে ওরা?'

'সম্ভবত তোর ধারণাই ঠিক। কি ঘটছে, বুঝতে সময় নিয়েছে পুলিস—ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগটাই নিয়েছে ওরা।'

'টোটার লোকজন কয়েক হপ্তা আগে থেকে রিহার্সেল দিয়েছে।'

'তুই আরও বলছিস, টোটার দলে সবশেষে যে লোকটা যোগ দেয় তাকে আসলে ওরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, তুই যাতে তাকে টোটা মনে করে গুলি করতে পারিস। কেন?'

'আসল কাজে আমি যাতে ওদেরকে বাধা দিতে না পারি, তাই।'

'কিন্তু সেজন্যে এত কাঠ-খড় পোড়াবার কি দরকার ছিল? ওরা তোকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেনি কেন?'

চমকে উঠল রানা। সত্যিই তো! সে চেষ্টা করেনি কেন! 'কি জানি।'

'হতে পারে, প্রিন্সের মত তোকেও হয়তো ওদের দরকার।'

'আমাকেও ওদের দরকার?' তীক্ষ্ণ চোখে সোহেলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তাই যদি হবে, তাহলে আমাকেও কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেনি কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'করেনি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে করবে না। দেখ কি হয়।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে বাধা দিয়ে আবার বলল সোহেল, 'একটা ব্যাপারে আমরা তোকে ইচ্ছে করেই অন্ধকারে রেখেছি, তার কারণও আছে। প্যারিস থেকে তুই ব্যাংককের মাটিতে পা দেয়ার সাথে সাথে আমরা তোকে ক্লোজ অবজারভেশনে রেখেছি। টোটার মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোকে আমরা প্রোটেকশন দিয়ে যাব। টোটা আর তার সেল তোকে ঘাঁটায়নি, সেটা তোকে ভয় পায় বলেও নয়, তোকে বাঁচিয়ে রাখার পেছনে

কোন মানবিক কারণও নেই। তোকে দিয়ে এই যে এত ঝড়-ঝাপটা আর ঝামেলা সহ্য করল ওরা, এর পেছনে হয়তো অন্য কারণ আছে।'

রানার মনে হলো, কথা বলার একটা নেশা পেয়ে বসেছে সোহেলকে, এই মুহূর্তে তাকে বাধা দেয়াটা ভুল হবে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল ও।

'টোটা বুঝবে, কিসের বিরুদ্ধে লেগেছে সে। প্রিন্সকে কিডন্যাপ করা তার মিশনের প্রথম পর্যায় মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়, প্রিন্সকে নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া। এই পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যানটাও নিশ্চয় আগে থেকে তৈরি করে রেখেছিল সে। কিন্তু তার সেই প্ল্যান তুই রুম সিক্সে ওয়ার্নিং সিগন্যাল পাঠিয়ে ভেঙে দিয়েছিস। আমার বিশ্বাস, টোটার প্ল্যান ছিল অ্যাম্বুলেন্সে তুলে প্রিন্সকে কোন প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে নিয়ে যাওয়া। তোর সিগন্যাল পেয়ে রুম সিক্স তাতে বাদ সেধেছে।'

সোহেলের কথা শুনছে রানা, সেই সাথে মাথাও কাজ করছে। বলল, 'অ্যাম্বুলেন্সে রেডিও থাকে, পুলিস যে ব্যাপক তল্লাশী শুরু করে দিয়েছে এ-খবর পেয়ে গেছে ওরা।'

'ওরা এখন কি করবে বলে তোর ধারণা?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'টোটার মিশন শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'আমার মিশনও শেষ হয়নি। টোটার কাজ থাইল্যান্ড থেকে প্রিন্সকে নিয়ে পালানো। আমার কাজ প্রিন্সকে উদ্ধার করা। সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা আমাকে বিরক্ত করছে—প্রিন্সকে কিডন্যাপ করা হলো কেন?'

'তাঁকে কিডন্যাপ করা হবে, বা হতে পারে, আগে আমরা ভাবিনি,' বলল সোহেল। 'ঘটনাটা ঘটে যাবার পর অবশ্য ধাপে ধাপে প্রায় সবই মিলে যাচ্ছে।'

আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে এল রানার মনে, ওর মিশন সম্পর্কে টোটা জানল কিভাবে। উত্তম আবদুল্লার কথা মনে পড়ল। উঁহু, এই লোককে সন্দেহ করার কোন যুক্তি নেই। শোভাযাত্রার রুট দিয়েছে। জানিয়েছে, টোটার দলে নতুন একজন লোক যোগ দিয়েছে। নিজেকে তিরস্কার করল রানা। ওই খবরটা শুনে তার ধারণা হওয়া উচিত ছিল, হঠাৎ একজন অতিরিক্ত লোক মানেই টোপ।

ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ঘরের আরেক কোণে গিয়ে রিসিভার তুলল সোহেল। 'দেখছি,' বলে ইন্টারকমের সুইচ অন করল। 'দীনা, তোমার ফোন।'

'নিশ্চয়ই বাইরে থেকে আসেনি?' জানতে চাইল রানা।

'বাইরে থেকে,' জানাল সোহেল। 'রুম সিক্সের স্পেশাল লাইন আছে।' টেবিলের ওপর রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের জায়গায় ফিরে এল সে।

ঘরে ঢুকে রানার দিকে একবার তাকাল দীনা, কিন্তু সাথে সাথে ফিরিয়ে

নিল দৃষ্টি। সোহেলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আপনারা থাকুন, প্লীজ। দু'এক মিনিটের বেশি বিরক্ত করব না।' এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে রিসিভার তুলল সে।

রিসিভারে হুঁ, হাঁ, বেশ, আচ্ছা এইসব বলল দীনা, অপরপ্রান্তের কথা খুব মন দিয়ে শুনছে সে।

'রুম সিক্স কি?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'আসলে সব কথা তোকে জানাবার অধিকার আমারও নেই, রানা,' বলল সোহেল। 'সুযোগ হলে, ওকে জিজ্ঞেস করিস,' ইঙ্গিতে দীনাকে দেখাল সে। 'ও যদি চায়, তোকে জানাতে পারে।'

'বলছিস, রুম সিক্স আমাকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। এই ফেভারটা ওরা করছে কেন?'

'সুনাম আছে এই রকম একটা অর্গানাইজেশন বা ইউনিট যদি আমাদের একজন এজেন্টকে প্রোটেক্ট করার প্রস্তাব দেয়, কখনোই আমি তা খারাপ মনে করি না। এতে ক্ষতি তো নেই-ই, বরং সব দিক থেকে লাভ।'

কথা বলছে বটে, তবে সোহেলের কান পড়ে আছে দীনার দিকে। কিন্তু কাজের কথা কিছুই বলছে না মেয়েটা। কি ধরনের কল হবে তা বোধহয় আগে থেকেই জানত, আন্দাজ করল রানা, তা না হলে ঘরে ওদেরকে থাকতে অনুরোধ করত না। রিসিভার রেখে দিয়ে ওদের দিকে তাকাল সে। বলল, 'রেডিও থাইল্যান্ড থেকে খবরটা এইমাত্র প্রচার করা হয়েছে।'

মুখ তুলে দীনার দিকে তাকাল সোহেল, বলল, 'তারমানে সারা দুনিয়া জেনে গেল।'

মৃদু হাসল দীনা। 'এক সময় না এক সময় জানতই।' চট করে একবার রানাকে দেখে নিল সে। 'অ্যাম্বুলেন্সটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শোভাযাত্রা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল, ওটার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার আধঘণ্টা পর জানানো হয়, ওটা চুরি গেছে।'

'কোথায় পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'শহরের ভেতর, নদীর ধারে। ক্রুদেরও পাওয়া গেছে, অন্য জায়গায়। সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। কারও পরনে ইউনিফর্ম ছিল না।' দরজার দিকে এগোল দীনা।

'সার্চ কি রকম এগোচ্ছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা অংশ নিচ্ছে?

'জিজ্ঞেস করুন কারা অংশ নিচ্ছে না,' এই প্রথম রানার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ একটু হাসল দীনা। 'সত্যি, আপনি একটা কাজের কাজই করেছেন!' সামান্য একটু প্রশংসা, কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাল লাগল রানার। 'আপনি যদি ওয়ার্নিং সিগন্যাল না দিতেন, এখনও শুরুই হত না সার্চ।'

চেহারা একটু গম্ভীর করে তুলে রানা বলল, 'আমি একটা প্রশ্ন করেছি।'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল দীনা। এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানার

দিকে, যেন বোঝার চেষ্টা করল ওকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'দুঃখিত। মেট্রো পুলিস, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিক্রেট পুলিস, সি-আই-ডি, অক্সিলারি সার্ভিস, ক্রাইম সাপ্রেশন ডিভিশন, রেডিও এবং অ্যান্টি-রায়ট ইউনিট, এমন কি আর্মিও—রাজা একটা ইমার্জেন্সী ডিক্রি ইস্যু করেছেন। কমান্ডো ইউনিট-গুলোকে ব্যাংককে ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

রানা বুঝল, টেলিফোনে যা শুনেছে তাই গড় গড় করে বলে যাচ্ছে দীনা। জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা পরিষ্কার জানতে চাই আমি। তোমরা কি আমাকে এখনও বিরক্ত করবে?'

'মানে?' পটলচেরা চোখ তুলে নিরীহ দৃষ্টিতে তাকাল দীনা, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

'মানে সদ্যোজাত শিশু মাসুদ রানাকে তোমরা কি এখনও কোলে করে দুদু দেবে?'

চেহারা দেখে বোঝা গেল অস্বস্তি বোধ করছে সোহেল।

'আমরা আপনাকে হারাতে চাই না,' শান্ত সুরে বলল দীনা।

'কিন্তু হারাতে হবে,' বলল রানা। 'আমি গা ঢাকা দিতে যাচ্ছি।'

'আপনি যাতে আমাদের চোখের আড়াল হতে না পারেন, সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব।'

'কারণটা কি জানতে পারি?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

উসখুস করছে সোহেল।

'পারেন,' বলল দীনা। 'প্রিন্সকে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে আমরা জানি। আপনি জানেন না। সেটাই কারণ।'

আট

শহর অবরোধ করা হয়েছে।

বেরুবার সবগুলো মুখে বসানো হয়েছে রোড-ব্লক, পাহারায় রয়েছে রয়্যাল থাই আর্মি। শহর ছেড়ে যে-সব যানবাহন বেরিয়ে যেতে চাইছে, তাদের সামনে একের পর এক আসছে কাঁটাতারের বেড়া, ট্যাঙ্ক-ট্র্যাপ, মেশিনগান পোস্ট। এসব বাধা টপকে সামনে এগোতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে সব ধরনের গাড়িকে। প্রতিটি গাড়ি নিখুঁতভাবে সার্চ করার পরই শুধু এগোবার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। শহর ছাড়তে হলে প্রতিটি লোককে ব্যাংকক স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে অনুমতি পেতে হবে, কেউ অনুমতি-পত্র দেখাতে না পারলে সাথে সাথে গ্রেফতার করে সোজা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে তাকে।

আঠারোটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনের বিমান ওঠানামা করে ডন মুয়াং এয়ারপোর্টে, ব্যাংকক থেকে যে-সব প্যাসেঞ্জার বাইরে কোথাও যাবে তাদেরকে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইনের মিনিবাস। রোড-

ব্লকের সামনে মিনিবাস দাঁড় করানো হয়, প্রতিটি প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে চাওয়া হয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিশেষ অনুমতি-পত্র। সশস্ত্র পুলিস গার্ড মিনিবাস থেকে একেবারে সেই এয়ারপোর্টের ভেতর গিয়ে নামে। ইতোমধ্যে তারা মিনিবাস সার্চ করে, সার্চ করে প্রতিটি প্যাসেঞ্জারকে। এত কিছুর পর, সবশেষে সার্চ করা হয় প্রতিটি বিমান। বাস ও ট্রেন, যেগুলো শহর থেকে বেরুবে, প্রত্যেকটা সার্চ করা হয়। শুধু তাই নয়, সশস্ত্র পুলিস যাত্রীদের পরিচয়-পত্র, অনুমতি-পত্র পরীক্ষা করার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নেয়।

যারা ব্যাংককে ঢুকতে চায়, তাদেরকে আগেভাগেই সাবধান করে দিয়ে বলা হচ্ছে, একবার ঢুকলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। ইমার্জেন্সী এগজিট পারমিট পেতেও কয়েকদিন সময় লেগে যাবে।

ইনফ্যান্ট্রি সার্চ পার্টিকে ধান খেত, ঝিল-ঝিল, খেত-খামার আর বন-জঙ্গল সার্চ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এদের সাথে রয়েছে রেডিও কম্যুনিকেশন সিস্টেম, আর্মড ইনপেকশন ভেহিকেল আর হেলিকপ্টার। কোন বিরতি ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছে ওরা।

চাও ফারায়া নদীতে টহল দিচ্ছে নৌ-বাহিনীর গান-বোট। নৌকা থেকে শুরু করে সব ধরনের জলযানকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, রিভার পুলিসের সার্চ পার্টির কাছ থেকে সার্টিফিকেট না নিয়ে কেউ যেন শহরের সীমানা না পেরোয়। তল্লাশী চালাবার জন্যে রিভার পুলিসের সাথে যোগ দিয়েছে সাত হাজার নৌ-বাহিনীর সদস্য। নদীর দু'ধারে বসানো হয়েছে মেশিনগান পোস্ট।

আক্ষরিক অর্থেই ডন মুয়াং এয়ারপোর্টকে ঘিরে রেখেছে সশস্ত্র গার্ডদের একটা বৃত্ত। রয়্যাল এয়ারফোর্সের আর্মড ইউনিটগুলো প্রতিটি প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে সশরীরে হাজির হয়ে সীল করে দিয়েছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক, খুলে নিয়েছে প্রতিটি বিমানের ডিসট্রিবিউটর রোটর। প্রতিটি এয়ারফিল্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হ্যাঙ্গার বা মুরিং এলাকার দিকে কোন আগন্তুককে এগোতে দেখলেই সাথে সাথে রিপোর্ট করতে হবে।

উত্তর আর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে দশ হাজার পুলিস, অক্সিলারি ফোর্সগুলোর সাথে কাজ করছে তারা। একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম ধরে প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি বাড়ি প্রতিটি ঘর সার্চ করা হচ্ছে। শহরের ট্রাফিক-কন্ট্রোল প্ল্যানাররা একটা সার্চ-প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়েছে, সেই প্যাটার্ন অনুসারে গোটা শহর চষে বেড়াচ্ছে মোবাইল প্যেট্রল। সার্চ পার্টিতে যারা আছে তারা সবাই সশস্ত্র।

থিয়েটার, সিনেমা আর ডান্স হলগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, খুব কম লোকই বাইরে খেতে বেরোয়। সরকার অনুরোধ জানিয়েছে, প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বাইরে ঘুরে না বেড়ায়। এই সব আটকানো কড়াকড়ির ফলে শহর হয়ে উঠেছে নিষ্প্রাণ, নিরানন্দ। সবাই একটা অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। রাতে কোন গান-বাজনা শোনা যায় না। মন্দিরের সোনালি গম্বুজগুলো নিঃশব্দ গাছের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। শহরের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, এই উপলব্ধি হতবাক করে তুলেছে

সবাইকে। সম্মানীয় মেহমানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন নয় এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। যারা মারা গেছে তাদের জন্যেও গোটা শহর শোকে মুহ্যমান।

ক্যাডিলাকের ধাক্কায় মারা গেছে সতেরো জন লোক। সন্ধের পর হাসপাতালে মারা গেল আহতদের আরও তিনজন।

থাই রেডিও প্রতি ঘন্টায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া প্রচার করছে। এই ঘটনার নিন্দায় সবাই মুখর। দেশের খুব কম খবরই বেরুতে পারছে বাইরে।

'জানা কথা,' রানাকে বলল উত্তম আবদুল্লা, 'এসবে কোন ফল হবে না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তো আর চলে না, তাই এত আয়োজন করে খোঁজাখুঁজি। কিন্তু রেজাল্ট আশা করা বৃথা।'

রুম সিক্স থেকে তখনও বিদায় নেয়নি রানা, উত্তম আবদুল্লার মেসেজ এল দূতাবাসে, রানার সাথে দেখা করতে চায়। দূতাবাস থেকে সোজা আবদুল্লার বাড়িতে চলে এসেছে ও। ওর এখন তথ্য দরকার, সামান্য খড় কুটো পেলে তাও আঁকড়ে ধরার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কাজ শুরু করার জন্যে কিছু একটা সূত্র পেতে হবে ওকে।

'আপনার ধারণা, প্রিন্সকে ওরা এখনও শহরের মধ্যে রেখেছে?'

'অবশ্যই।'

কালো আলখাল্লা পরে প্রকাণ্ড সোফায় বসে হাতে বানানো সিগারেটে মাঝে মধ্যে টান দিচ্ছে আবদুল্লা, ঘরের ভেতর এরিনমোর তামাকের কড়া গন্ধ।

'সবচেয়ে কাছের এয়ারফিল্ড গাড়িতে মাত্র দু'ঘন্টার পথ,' বলল রানা।

'দু'ঘন্টা অনেক বেশি সময়। অ্যাম্বুলেন্স রওনা হবার মাত্র কয়েক মিনিট পর ওয়ার্নিং সিগন্যাল দেন আপনি। তারপর আধ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে শুরু হয় সার্চ।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আবদুল্লা। 'উহুঁ, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এয়ারফিল্ডে যেতে পারেনি ওরা। গাড়ি বদল করার সময়ও পায়নি।'

'আপনি বলছেন এই সার্চে কোন কাজ হবে না। কেন হবে না?'

'হবে না এইজন্যে যে ওরা কোথায় কোথায় সার্চ করবে টোটার তা জানা আছে,' বলল আবদুল্লা। 'কাজেই এমন এক জায়গায় লুকিয়েছে সে, যেখানে সার্চ করার কথা কেউ ভাবতেও পারবে না।'

রানা আরেকটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, ওকে বাধা দিয়ে আবদুল্লা বলল, 'গোটা ব্যাংককে মাত্র দু'জন লোক আছে যারা টোটা আর তার সেলকে খুঁজে পাবার আশা করতে পারে। একজন আমি। আরেকজন আপনি।'

হেসে ফেলল রানা। 'বুঝলাম না।'

'টোটা আর তার সেলকে সবচেয়ে ভাল চেনেন একমাত্র আপনি। পুলিসও তাকে দিন কয়েক চোখে চোখে রেখেছিল বটে, কিন্তু ওরা ডিউটি দিচ্ছিল দায়সারা করে। টোটাকে নিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল আপনার, তাই যতটা সম্ভব ভালভাবে তাকে চিনে নেয়ার গরজ ছিল।'

'আর আপনার ব্যাপারটা?'

'আমার রয়েছে তথ্য পাবার এমন সব উৎস, যার হদিস সম্পর্কে পুলিসের কোন ধারণাই নেই,' বলল আবদুল্লা। 'তাই বলছি, আসুন, একটা টীম হিসেবে কাজ করি আমরা। আমার লোকেরা এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এমন সব জায়গায় খোঁজ করছে তারা, পুলিস যেখানে পৌঁছুতে পারবে না। এমন সব লোককে প্রশ্ন করছে তারা, পুলিস যাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগই পাবে না।'

'আমি তাহলে তথ্য পাব বলে আশা করতে পারি?'

'অবশ্যই,' জোরাল আশ্বাস দিল আবদুল্লা। 'কিন্তু সেটা যে আপনি কখন পাবেন, বলা কঠিন। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর তথ্যটা আমার হাতে আসতে পারে, আবার দু'দিন দেরিও হতে পারে। তাই, আমাকে জানতে হবে, দরকারের সময় আপনাকে আমি কোথায় পাব।'

মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভক্ত হলেও আবদুল্লাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে রানার মন চাইল না। বলল, 'হোটেল ইন্টারকনে পাবেন আমাকে।' এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবার ইন্টারকনেই উঠবে ও।

'কিন্তু ওখানে আপনি সব সময় থাকবেন না।'

'কোথায় থাকব মি. সোহেল জানবেন।'

'কিন্তু মি. সোহেলকে যদি ওখানে না পাই?'

রানা বুঝল, ওখানে বলতে রুম সিক্সকে বোঝাল আবদুল্লা। সতর্ক লোক, নামটা উচ্চারণ করেনি।

'এক সময় না এক সময় পাবেনই,' বলল রানা।

'মি. লিয়েন মনতাজের মাধ্যমে আপনাকে খোঁজ করলে কিছু মনে করবেন?' জানতে চাইল আবদুল্লা।

একটা সেফ হাউস সাধারণ কোন জায়গা নয়। এই একটা জায়গা সবার কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়। 'এই খবর কোত্থেকে পেলেন আপনি?'

'আমার বিজনেস-সিক্রেট জানতে চাইবেন না, প্লীজ!'

গম্ভীর দেখাল রানাকে।

'আপনাকে আমি মোটর শোভাযাত্রার রুট জানিয়েছি। জানিয়েছি, টোটার সেলে একজন নতুন লোক ঢুকেছে। আরও দু'একটা দরকারী খবর আমার কাছ থেকে পেতে পারেন আপনি। কিন্তু এই সুযোগ আপনি নেবেন কিনা, সেটা আপনার ওপরই নির্ভর করে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'দু'জনের যে-কোন একজনকে আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু এত কিছু করছেন আপনি, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাইছেন না কেন?'

আহত দেখাল আবদুল্লাকে। বলল, 'দিনকাল এমন পড়েছে, কারও উপকার করলেও লোকে মনে করে এর মধ্যে নিশ্চই কোন স্বার্থ আছে। আমি তো আগেই বলেছি, মেজর রাহাত ছিলেন ফেরেস্তা। যদিও তাঁর সান্নিধ্যে এসেও আমি মানুষ হতে পারিনি, হয়েছি একটা দু'মুখো সাপ। কিন্তু তাঁর

লোকজনকে সাহায্য করার একটা সুযোগ যখন হাতে এসেছে, সেটা আমি ছাড়ব কেন? আর, টাকা যদি নিতেই হয়, আপনাদের কাছ থেকে নেব কেন? দিতে চায় এমন লোক আরও তো অনেক আছে।'

আবদুল্লার কথা আর ভাব-ভঙ্গির মধ্যে অতি-চালাকি বা ওই ধরনের কি যেন একটা রয়েছে, সেটা ঠিক ধরতে না পারলেও নিজেকে বলে রাখল রানা, একটু সতর্ক থাকতে হবে।

আবদুল্লার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দুশো গজ হেঁটে এসেছে রানা, এই সময় ওর পিছনে থামতে শুরু করল গাড়িটা। আওয়াজ পেয়েই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল ও, সরাসরি তাকাল। জানালাগুলো থেকে কিছু বেরিয়ে নেই।

লাইটপোস্টের আলোয় চকচক করছে গাড়ির ছাদ। ধীরে ধীরে সোজা রানার দিকে এগিয়ে এল মরিস। ড্রাইভার একা, কোন আরোহী আছে বলে মনে হলো না।

রানার ঠিক পাশে এসে থামল গাড়িটা। দরজা খুলে দিল মেয়েটা। নিঃশব্দে উঠে তার পাশে বসল রানা। আবার গাড়ি ছাড়ল দীনা। প্রায় নির্জন, খালি রাস্তা, তবু আস্তে-ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে সে। সিনেমা হল আর বেশির ভাগ রেস্তোরাঁ অন্ধকার হয়ে আছে। চারোয়েন ক্রাঙ রোডে আলো আর প্রাণের অস্তিত্ব দেখা গেল শুধু এক জায়গায়, পুলিস স্টেশনে। স্টেশনের সামনে রিফিউয়েলিং-এর জন্যে পেট্রলকার ক্রুরা জড়ো হয়েছে।

ওদেরকে থামানো হলো। কাগজ-পত্র দেখিয়েও সন্তুষ্ট করা গেল না, গাড়ি থেকে নামতে হলো। গাড়িটাকে নিখুঁত ভাবে সার্চ করল ওরা। তারপর দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দিল।

রানা ভাবল, এইটুকুই করতে পারে ওরা। সবাইকে চেক করবে, প্রতিটা বাড়ি সার্চ করবে, কিন্তু ওদের কোন দিক-নির্দেশ নেই, অর্থাৎ ওদের অবস্থাও ওরই মত। নিহত ড্রাইভারের মাথা থেকে বুলেটটা উদ্ধার করেছে ওরা, কিন্তু যে রাইফেল থেকে সেটা ছোঁড়া হয়েছে সেটার কোন হদিস করতে পারেনি। সাংবাদিকরা ছিল পিছনের গাড়িতে, ঘটনাটার ছবি তোলার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। অনেক খোঁজ করেও এমন কোন লোককে পাওয়া যায়নি যে ঘটনাটার ছবি তুলেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে বিবরণ নেয়া হয়েছে, কিন্তু একজনেরটার সাথে আরেকজনেরটা মেলে না।

এমন কি অত উঁচু থেকে চোখে ফিল্ড গ্লাস নিয়েও কিছু পরিষ্কার দেখতে পায়নি রানা।

তবু চেষ্টা করে যাচ্ছে পুলিস। কারণ, রুটিন ওয়ার্কও অনেক সময় সুফল বয়ে আনে। লোকবল বেশি হলে সম্ভাবনা আরও বাড়ে।

সাউথ স্যাদর্ন রোড। ওদের বাঁদিকে রয়েছে সমান্তরাল ভাবে রুড রোড। রাস্তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। দীনার হাতে কোন অলঙ্কার নেই, শুধু ছোট্ট একটা লেডিস ঘড়ি। কি সুন্দর আঙুল। কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত মিহি লোম।

কড়া কথা বলে এই আপদের হাত থেকে রেহাই মিলবে না, এটুকু বুঝে নিয়েছে রানা। নাম রেখেছে শুঁয়োপোকা, তা জেনেও রাগ করেনি মেয়েটা, আশ্চর্যই বলতে হবে। কর্তব্যের খাতিরে ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না বোধহয়। সোহানা জানিয়েছে, দীনার আসল চেহারা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। কথাটার মানে কি?

ইতোমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে রানা, কোথায় কি চাকরি করে দীনা।

নর্থ স্যাদর্ন রোড। ইমিগ্রেশন অফিসের পাশ দিয়ে এগোল গাড়ি। হোটেল ইন্টারকনের দিকে যাচ্ছে দীনা। গা ঢাকা দেয়ার আগে ওটাই ছিল রানার শেষ ঠিকানা। তিনদিনের জন্যে রানাকে হারিয়ে ফেলেছিল মেয়েটা।

কি ঘটতে যাচ্ছে, পরিষ্কার বুঝল রানা। এখন আর ঘটনাটা ঠেকাবার উপায় নেই। সচরাচর এই-ই হয়। একে শত্রু নয়, দ্বিতীয়ত মেয়ে, তার ওপর পরিচয়টাই যদি ঝগড়া-ঝাঁটি দিয়ে শুরু হয়, মাঝপথে পরস্পরের কাছে পরস্পরের আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি কি! দু'জনেই চাইছে, ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটুক। তা ঘটাবার একটাই তো উপায়—পরস্পরের আরও কাছে আসা।

লামপিনি পার্কের কাছে পুলিস পেট্রলের কয়েকজন পুলিস একজন লোককে ধরে গাড়িতে তুলছে। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল লোকটা, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। পিছু ধাওয়া করে আবার ধরা হলো তাকে, ঠেলে তুলে দেয়া হলো ভ্যানে। লোকটার একপাটি জুতো পড়ে থাকল রাস্তার ওপর। এইরকম কয়েকশো লোকের মধ্যে এ হলো একজন। সার্চ শুরু হবার পর থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটক করা লোকে এরই মধ্যে ভরে গেছে সেন্ট্রাল জেল।

বিদ্যায়ু রোড। ওদের বাঁদিকে, আকাশের অনেক ওপরে একটা আলো দেখা গেল। হেলিকপ্টার। নদীর ওপর টহল দিচ্ছে।

দূতাবাস থেকে বেরুবার পর থেকেই রানার পিছু নিয়েছিল দীনা। আবদুল্লার বাড়িতে আধঘণ্টার মত ছিল ও, ওর জন্যে আশপাশে কোথাও অপেক্ষা করছিল সে। এই আধঘণ্টা গাড়িতে একা বসে চিন্তা-ভাবনা করে কাটিয়েছে।

তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দীনা। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে চায়। কাছে আসবে।

এতক্ষণ ওদের মধ্যে কোন কথা হয়নি। ঝগড়া আর মিল, দুইয়ের মাঝখানে এই নির্বাক সময়টা বীজ রোপণের ক্ষেত্র তৈরি করে দিচ্ছে।

দীনার মাথা একটু উঁচু হলো, কিন্তু রানার দিকে তাকাল না। 'তোমার মনে আছে,' জানতে চাইল সে, 'জাফর নামে এক লোকের কথা? রিয়াদ, সৌদি আরব, গত বছর জুলাই?'

প্রিন্স ফরহাদকে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে, সাথে সাথে বুঝে নিল রানা।

নয়

জাফর আলি তার আসল নাম নয়। আসল নাম ন্যাট চাগাল, একজন ইসরায়েলি ইহুদি। গত বছর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় তাকে, অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সৌদি হাইকোর্ট তাকে যাবজ্জীবন দেয়।

ব্যাপারটা রিয়াদ কেস নামে পরিচিতি পেয়েছিল।

রিয়াদ সাইন্টিফিক রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে একদল বিশিষ্ট ফিজিসিস্ট দু'বছর ধরে অত্যন্ত গোপনীয় একটা প্রজেক্টে কাজ করছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর হাফিজুর জায়েরি এবং পাকিস্তানের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর ওয়াহিদ সাদানী ছিলেন এই প্রজেক্টের জয়েন্ট ডিরেক্টর। ইসলামিক উন্নয়ন সংস্থার বিশেষ গ্রান্ট থেকে এই প্রজেক্টের খরচ জোগানো হচ্ছিল। পাকিস্তান, মিশর আর বাংলাদেশ থেকে একজন করে বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে এই প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়।

লেজার (লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেট এমিশন অভ র‍্যাডিয়েশন) ডিভাইসকে উন্নত ও সফিসটিকেটেড করাই ছিল এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য। ওটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অসিলেটর, অতি সূক্ষ্ম বা অতি সরু-ওয়েভ লেন্থ ব্যান্ডে লাইট-ওয়েভকে নির্দিষ্ট একটা পথে রশ্মির মত চালিত করতে পারে, যা কিনা অন্য কোন আলোর চেয়ে দশ লক্ষগুণ বেশি উজ্জ্বল।

চোখের সার্জারিতে লেজার বীম সফলতার সাথে কাজে লেগে আসছে, ব্যবহার করা হয় মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে। সেই একই পদ্ধতিতে দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে শুক্রগ্রহে পাঠানো লেজার বীম প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে পৃথিবীতে, ধরা পড়ছে অপটিক রিসেপটরে। এই দুই চরম দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় লেজারের রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। লেজার যে একটা মহাশক্তি, সে-ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। মহাশক্তি বলেই একে নিয়ে এত রাখ-রাখ ঢাক-ঢাক। লেজারকে আরও উন্নত করার জন্যে বহু দেশেই গবেষণা চলছে, সবখানে রয়েছে কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা।

জায়েরি-সাদানী প্রজেক্ট ওই দু'বছরে যেসব ডাটা তৈরি করে সেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই টপ সিক্রেটের তালিকায় জায়গা করে নেয়। এই গবেষণার সমস্ত ফলাফল ও সম্ভাবনাকে পাহারা দিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব চেপেছিল সৌদি স্পেশাল ব্রাঞ্চ আর সি-আই-ডি-র ওপর। কিন্তু সংস্থা দুটো যে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে তা জানা গেল গত বছর জানুয়ারি মাসে।

সউদী ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট, একটা মিশনের টেকনিক্যাল হ্যান্ড হিসেবে কাজ করছিল তেহরানে। হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে একটা সিগন্যাল ইন্টারসেপ্ট করল সে। ব্যাপারটা হেডকোয়ার্টারকে রিপোর্ট করতেই তারা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাবাই নম্বর টয়েনবি রোডে গাড়ি পাঠিয়ে দিল। ইতোমধ্যে তারা জেনেছে, জাফর আলি একজন সিরিয়ান, স্কলারশিপ

নিয়ে পড়তে এসেছে রিয়াদ ইউনিভার্সিটিতে। অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সের ছাত্র সে। রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে তার বেশ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আছে। ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেল তাকে। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু ইন্টেলিজেন্সের লোকজন সময়মত ধরে ফেলে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, সিক্রেট অ্যাক্ট-এর আওতায় যে-সব তথ্য রয়েছে সে-সব পাওয়া গেছে তার কাছে।

এরপর পরই শুরু হলো ব্যাপক অনুসন্ধান, তদন্ত আর তল্লাশী। ইন্টেলিজেন্সের একটা টীম রিপোর্ট দিল, রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে যে ফুটোটা পাওয়া গেছে সেটা অত্যন্ত গুরুতর ধরনের। গ্রেফতারের দিন জাফর আলির ফ্ল্যাটে তল্লাশী চালিয়ে পাওয়া গেছে দুটো টপ সিক্রেট ফাইল আর থার্ড-ফেজ টেকনিক্যাল ড্রইং-এর মাইক্রোডট ফটোগ্রাফ। ড্রইংগুলো ছিল লেজার ইনস্ট্রুমেন্টের, প্রচলিত ইনস্ট্রুমেন্টের তুলনায় এতই উন্নত ধরনের ও অত্যাধুনিক যে শক্তিবৃদ্ধির জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে আছে এমন যে-কোন সরকার এই ডাটাগুলো পাবার জন্যে ছল-বল-কৌশল কিছুরই আশ্রয় নিতে দ্বিধা করবে না।

কেস ও তদন্ত চলতে থাকে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে অনেক গোপন তথ্য। সিরিয়ায় খবর নিয়ে জানা গেল, সেখানে জাফর আলির কেউ নেই। তার কাগজ-পত্র সবই জাল, তৈরি করে দিয়েছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল। এরপর ইন্টারোগেট করে জানা গেল জাফর আলির আসল নাম ন্যাট চাগাল, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট সে। গ্রেফতার হবার দিনকয়েক আগে সিরিয়ায় ফেরার অনুমতি চেয়েছিল চাগাল, কারণ হিসেবে বলেছিল তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাবে। গ্রেফতার না হলে আর তিনদিন পর সৌদি আরব থেকে বেরিয়ে যেত সে। গ্রেফতারের সময় তার ঘরে গুছানো সুটকেস পাওয়া যায়।

বিচারে শুধু চাগালের একার শাস্তি হয়নি। টপ সিক্রেট তথ্য সংগ্রহে তাকে যারা সাহায্য করেছিল তাদেরও জেল জরিমানা হয়। রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্টে যে ফুটোটা ছিল সেটা বন্ধ করা হয়েছে শুনে দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সবাই জানল, সময়মত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় অমূল্য তথ্যগুলো দেশের বাইরে পাচার হতে পারেনি। চাগাল জেল খাটছে, কাজেই তার আর কোন ক্ষতি করার সাধ্য নেই। রিয়াদ কেসের ওখানেই সমাপ্তি ঘটে।

'কোথায় ছাড়বে আমাকে?' জানতে চাইল রানা।

রানা মরিসে ওঠার পর থেকে এই প্রথম ওর দিকে তাকাল দীনা। 'চাগালের কথা বললাম তোমাকে, এটা তোমার কাছে কোন খবর নয়?'

'বিরাট খবর…'

'সেজন্যে সামান্য একটা মৌখিক ধন্যবাদও কি আমি পেতে পারি না?'

'সাবধান, অ্যাক্সিডেন্ট কোরো না।' বলে একটা হাত তুলে দীনার

কুৎসিত জন্মদাগটার ওপর আঙুল ছোঁয়াল রানা।

'কি করছ!' আতঙ্কিত হয়ে উঠল দীনা। 'প্লীজ, হাত সরাও!'

'তোমাকে সুন্দর করছি,' বলল রানা। 'আমি এভাবেই ধন্যবাদ জানাই। সুন্দরী বানিয়ে ছাড়ি।'

জন্মদাগের কিনারায় একটু নখ ঘষতেই সামান্য ছাল উঠে গেল। মৃদু হেসে ছালটা ধরে টান দিল ও, দীনার গাল থেকে পশমসহ পুরো জন্মদাগটাই খসে এল ওর হাতে।

ফুটপাথের ধারে গাড়ি দাঁড় করাল দীনা। মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। একাধারে রাগ, বিস্ময় ও ক্ষোভের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'জানলে কিভাবে?'

'জানিনি,' বলল রানা। 'সোহানার একটা কথায় আন্দাজ করে নিয়েছি।'

'সোহানা? সোহানাদি' ব্যাংককে?' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল দীনা।

'না। ওর একটা মেসেজ পেয়েছি। বলেছে, দীনার আসল চেহারা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই। মেসেজটা পাবার পর থেকেই ভাবছিলাম এর কি অর্থ হতে পারে!' সোহানা আরও কি বলেছে তা আর ফাঁস করল না রানা।

উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনের রাস্তা, তারপর ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছন দিকটা দেখে নিল দীনা। 'ভাগ্যিস কেউ দেখে ফেলেনি!' রানার দিকে ফিরল সে। 'ওঁয়োপোকাটা দাও।'

'উঁহু,' বলে দীনার গালে ঠিক জায়গামত নকল জন্মদাগটা আবার সেঁটে দিল রানা। 'ইশ্‌শ্! আগুনের মত চেহারাটা কি করে রেখেছ!'

'আর কিছু বলেনি সোহানাদি?' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মৃদু সুরে জানতে চাইল দীনা।

'বলেছে,' চেহারাটা নির্লিপ্ত করে তুলে বলল রানা, 'তুমি নাকি আমার ফ্যান। অন্ধ-ভক্ত।'

'যাহ্, মিথ্যে কথা!'

দীনাকে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। কে বলবে এই মেয়েই তার সাথে ভাঁট দেখিয়েছে, এমন ভাব করেছে যেন ওকে গ্রাহ্যই করে না. মেয়েরা কখন যে কি, বোঝে কার সাধ্য। মুচকি হাসল ও, বলল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। সমান পদমর্যাদার অফিসাররা পরস্পরের ভক্ত হতে পারে না।'

'আচ্ছা, তুমি জানো, আমি কোথায় আছি?'

'বি.সি.আই.-এর একটা স্পেশাল ইউনিটে,' বলল রানা। 'মাত্র তৈরি করা হয়েছে। এই ইউনিটের একমাত্র দায়িত্ব, বি.সি.আই. এজেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। নির্দেশ আছে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সংশ্লিষ্ট এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করা চলবে না, এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত গোপন রাখতে হবে। তেমনি, এই ইউনিটকে প্রচুর স্বাধীনতা এবং ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে।

যেমন, শুধু চীফ ছাড়া আর কারও কাছে রিপোর্ট করতে এরা বাধ্য নয়। যতদূর বুঝি...'

'কি করে জানলে?' উত্তর ঠিক হয়েছে দেখে রেগে গেল দীনা। 'নিশ্চয়ই চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জানিয়েছে?'

'না,' বলল রানা। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম, লেগে গেল, এই আর কি।'

জলতরঙ্গের আওয়াজ শুনল রানা। হাসি থামিয়ে বলল দীনা, 'তোমার ভক্ত যদি না-ও হই, হবার পথ পরিষ্কার হচ্ছে।'

'কি রকম!' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল রানা।

'এত সুন্দর ঢিল ছুঁড়তে পারো তুমি!'

'আরও একটা ধন্যবাদ পাওনা হলো তোমার,' বলল রানা। 'আমার ধন্যবাদের নমুনা সম্পর্কে জানোই তো!'

ভয় পেল দীনা। 'যদি মনে করে থাকো আমার ভুরু, চুল এসব ধরে টান দিলে...'

'না-না, তা কেন মনে করব!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তাছাড়া, ওগুলো নকল হলেও সৌন্দর্য বাড়ায়, খুলে নিলে কুৎসিত হয়ে যায় মেয়েরা। আমি চাই সৌন্দর্য বাড়াতে।'

'মানে!'

'মানেটা ভাল না। বলতে পারি, কিন্তু অভয়ে বলব, না সভয়ে?'

'সভয়ে।'

ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চাইল রানা বারকয়েক, তারপর বলল, 'মেয়েদের সাথে আরও অনেক জিনিস থাকে যেগুলো খুলে নিলে তাদের সৌন্দর্য লক্ষ কোটি গুণ বেড়ে যায়—তারা হয়ে ওঠে প্রকৃতির মত নিরাবরণ, সুন্দর...'

'অসভ্য।'

ঘাবড়ে গেল রানা। রাগ নয়, ঘৃণা নয়, কথাটা স্টেটমেন্টের মত বলল দীনা। সুরে যে কাঠিন্যটুকু ছিল, তার রেশ এখনও বাজছে ওর কানে। 'দুঃখিত,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

সব কথা থেমে গেল। নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে দীনা। অনেকক্ষণ পর বলল রানা, 'গুদামটা থেকে কিছু জিনিস নিতে হবে আমার।'

এক মিনিট পর গাড়ি ঘুরিয়ে গুদামের পথ ধরল দীনা। চেহারায় রাগটাগ কিছুই নেই, কিন্তু ঠোঁটে তালা। নাট চাগাল। ভাবতে শুরু করল রানা। দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও, কিছু লোকের মনে একটা ভয় থেকেই যায়। তাদের মধ্যে বিদেশী হিসেবে একজন ছিল সে। এসপিওনাজ জগতে কোথায় কি ঘটছে, এজেন্টদের সে-খবর রাখতে হয়। রিয়াদ কেসটা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করতে হয়েছিল তার, সউদী আরব শুধু বন্ধু রাষ্ট্র বলেই নয়, জায়েদি-সাদানী প্রজেক্টে বাংলাদেশেরও স্বার্থ জড়িয়ে ছিল।

রানা জানত, নাট চাগাল সাধারণ কোন এজেন্ট নয়। টেকনিক্যাল অপারেটরদের তালিকায় তার নাম সবার ওপরে। তার মাথাটা যে-কোন দেশের জন্যে অমূল্য এক সম্পদ। গড-গিফটেড ক্ষমতা রয়েছে তার।

ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী সে। দু'চোখ মেলে একবার যা দেখে, জীবনে কখনও ভোলে না।

তবু কিছু এসে যায়নি, কারণ জেলখানার ভেতর ছিল সে।

কিন্তু এখন ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে উঠতে যাচ্ছে।

'তার মানে, সোজাসুজি বিনিময়?' জানতে চাইল রানা।

প্রসঙ্গটা ধরতে অসুবিধে হলো না দীনার। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটা কোন রীতি নয়। সরকারী লেভেল থেকে এ-ধরনের আচরণ কল্পনা করা যায় না। সারা পৃথিবীর লোক যাকে চেনে, তাকে কিডন্যাপ করার কথা কিভাবে স্বীকার করবে একটা সরকার?'

দীনা চুপ করে আছে।

'স্পাইয়ের বদলে স্পাই, মেনে নেয়া যায়,' বলল রানা। 'কিন্তু...' হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা আসতেই চমকে উঠল ও।

উইন্ডস্ক্রীনে রানার প্রতিবিম্ব পড়ছে, সেদিকে চেয়ে রয়েছে দীনা। রানার পরিবর্তনটা আর দৃষ্টি এড়াল না। 'হ্যাঁ, তাই, তুমি যা ভাবছ। ব্যাপারটা সাদামাঠা এক্সচেঞ্জই। ওরা যদি প্রিন্সকে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যেতে না পারে, তোমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।'

'সেজন্যেই আমার দিকে রাইফেল তাক করেনি ওরা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। তোমাকে ওরা বিকল্প হিসেবে রিজার্ভ রেখেছে। প্রিন্সকে কিডন্যাপ করতে না পারলে তোমাকে করত।'

'আর সেটা প্রতিরোধ করাই তোমাদের মিশন।'

মাথা ঝাঁকাল দীনা।

রানার মনে হলো প্রথম থেকেই সব কথা ওকে জানানো উচিত ছিল। রাগ হলেও, নিজেকে সংযত করে রাখল ও। নীতি নির্ধারণ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার ওর নেই।

'তোমরা কাজ শুরু করলে কবে?' জানতে চাইল রানা।

'হপ্তা কয়েক আগে,' বলল দীনা। 'ন্যাট চাগালকে জেলখানা থেকে বের করে নিয়ে যাবার প্ল্যান তৈরি হচ্ছে, এই খবর গোপন সূত্রে জানতে পারে স্পেশাল ইউনিট। তারপর খবর এল, প্রিন্স ফরহাদ ব্যাংকক সফরে এলে তাকে খুন করার চেষ্টা হবে। দুটো খবরকে মেলাতে বা জোড়া লাগাতে পারছিলাম না আমরা। রিয়াদ সেন্ট্রাল জেলের সিকিউরিটি সিস্টেম ফুল প্রুফ, কমান্ডো পাঠিয়ে সুবিধে করতে পারবে না ইসরায়েল। একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে চাগালকে ফেরত পেতে পারে ওরা। কিন্তু বিনিময় করতে হলে, একজন ক্যানডিডেট দরকার। আর ক্যানডিডেট দরকার হলে প্রিন্সকে ওরা খুন করতে পারে না, কিডন্যাপ করতে পারে। কিন্তু আমাদের গোপন সূত্র জানাল, কিডন্যাপ নয় প্রিন্সকে ওরা খুন করারই প্ল্যান তৈরি করেছে। কাজেই, আমরা মেলাতে পারছিলাম না।'

'আসলে তোমাদের গোপন সূত্রের খবরে ভুল ছিল,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। তারপর আমরা খবর পেলাম, হুমকির কথা জানানো হলে প্রিন্স

তোমার নাম উচ্চারণ করেছেন। চমকে উঠলাম আমরা। বুঝলাম এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই সুযোগ ইসরায়েল হাতছাড়া করবে না। প্রিন্সকেও তারা খুন করবে আর চাগালের সাথে বিনিময়ের জন্যে তোমাকেও তারা কিডন্যাপ করবে।'

'কিন্তু আমার বিনিময়ে সউদী আরব চাগালকে ছেড়ে দেবে, ইসরায়েল তা আশা করে কিভাবে?'

'ইসরায়েল অনেক গোপন খবরই রাখে,' বলল দীনা। 'তারা জানে, রিয়াদ সাইন্টিফিক রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্ট আসলে ইসলামিক উন্নয়ন সংস্থার একটি প্রতিষ্ঠান। জায়েরি-সাদানী প্রজেক্টের খরচও জোগানো হয়েছে ইসলামিক উন্নয়ন সংস্থার নিজস্ব ব্যাংক থেকে। তারা এ-ও জানে, এই সংস্থার নিজস্ব একটা ইন্টেলিজেন্স আছে, এবং মাসুদ রানা সেই ইন্টেলিজেন্সের প্রথম সারির একজন এজেন্ট। কাজেই তোমার বিনিময়ে চাগালকে ফেরত চাইলে সৌদি আরব প্রস্তাবটা মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'তারপর?'

'তারপর আর কি, প্যারিস থেকে ব্যাংককে এসে প্রিন্সকে রক্ষা করার অ্যাসাইনমেন্ট বুঝে নিলে তুমি। আর আমরা ব্যাংককে এলাম তোমাকে প্রোটেকশন দেয়ার জন্যে।'

রানা জানতে চাইল, 'সউদী হোম অফিসে হুমকি গেল—পাঠাল কে?'

'ওদেরই একজন। যেন ঘটনাচক্রে তথ্যটা পেয়ে যায় সে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে চিঠিটা বেনামীতে পাঠায়।'

গুদামে পৌঁছুবার আগে আরও তিন জায়গায় থামানো হলো ওদেরকে। একবার ওদেরকে নামিয়ে গাড়ি সার্চ করল পুলিস। বাকি দু'বার পড়ল মোবাইল ইউনিটের সামনে, মরিসের নাম্বার প্লেট আর আরোহীদের দেখে নিয়ে হাত-ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল তারা।

গুদামের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল দীনা। একাই নেমে গেল রানা। গুদাম থেকে শুধু ওভারনাইট কেসটা নিয়ে বেরিয়ে এল একটু পরই, বাকি সব জিনিস ওখানেই থাকল লুকানো।

গাড়ি ছেড়ে দিল দীনা।

'প্রথম যেদিন আমি দূতাবাসে গেলাম,' বলল রানা, 'তুমি সত্যিই আমাকে চিনতে পারোনি?'

'না,' সহাস্যে বলল দীনা। 'আগে কখনও দেখলে তো! তোমার পরিচয় সম্পর্কে যখন আর কোন সন্দেহ রইল না, সাথে সাথে আমাদের মিশন শুরু হয়ে গেল। সেই মুহূর্ত থেকে তোমাকে আমরা একবারও চোখের আড়াল করিনি, শুধু একটা সময় বাদে, তুমি যখন...'

'কিন্তু আজ সকালে? শোভাযাত্রা যখন শুরু হলো? কোথায় ছিলাম, তোমরা জানো না।'

'ঠিক কোথায় তা না জানলেও জানতাম যে লিঙ্ক রোডেরই কোথাও ওত্ পেতে আছ তুমি।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'মন্দিরে

একটা লাশ পাওয়া গেছে, তুমি জানো?'

নিশ্চয়ই সেই তিনজন পুরোহিত আবিষ্কার করেছে। ওকে ছুটে পালাতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল ওদের। মন্দিরের ভেতর থেকে কিছু চুরি হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে লাশ পেয়ে গেছে। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না রানা। দীনাও আর কিছু জানতে চাইল না।

হোটেলে ফেরার পথে বিশেষ আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। আরও কয়েকবার থামানো হলো ওদেরকে। সারাটা পথ চাগালের কথা ভাবল রানা।

শুনানী চলার সময় তার উকিল বারবার বলেছিল, আমার মক্কেল মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছাত্র। ছাত্র পরিচয়টা কাভার বলেই ফিজিক্স সম্পর্কে তার পড়াশোনা ছিল, এটা ধরে নেয়া চলে। হয়তো মাইক্রোফটোগ্রাফারের ডাটা আর ড্রয়িংগুলো বোঝার মত যোগ্যতাও তার ছিল। এর সাথে তার আশ্চর্য স্মরণশক্তির কথা মনে রাখলে এই উপসংহারে পৌছুতে হয়, লেজার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে মূল্যবান ইনফরমেশন এখনও রয়েছে তার মাথায়।

আরেকটা সম্ভাবনা হলো, তার ফ্ল্যাটে যে মাইক্রোডট ফটোগুলো পাওয়া গেছে ওগুলো হয়তো ডুপ্লিকেট কপি, অরিজিন্যালগুলো আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল তেল আবিবে।

একটা ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই গ্রেফতার হবার আগে তেল আবিবে একটা সিগন্যাল পাঠিয়েছিল চাগাল। তার কাছে মহামূল্যবান ইনফরমেশন আছে, এই খবর সে তার কন্ট্রোলকে না জানিয়েই পারে না। জিওনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল জানত, রিয়াদে কি খুঁজছে চাগাল। তার মেসেজ পেয়ে এদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মূল্যবান ইনফরমেশনটা কি। সম্ভবত সেই মুহূর্ত থেকেই চাগালকে ফিরে পাবার জন্যে কাজ শুরু করে ওরা। ওদের একমাত্র লক্ষ্য, যে-কোন মূল্যে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ইন্টারকনে নতুন করে নাম লেখাল রানা। স্পেশাল ব্রাঞ্চের দু'জন অফিসার ওর কাগজ-পত্র পরীক্ষা করল। কি ভাগ্য, সেই আগের কামরাটাই খালি পেল ও। 'কি ব্যাপার?' দীনাকে লিফটে উঠতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি আবার! আমার মিশনটার কথা ভুলে গেলে? চোখে চোখে রাখছি তোমাকে।'

পোর্টারকে দোরগোড়া থেকেই বিদায় করে দিল রানা। ওর পিছু পিছু কামরায় ঢুকল দীনা, দরজাটা বন্ধ করল সে-ই। রানা আলো জ্বালতে যাবে, ওর একটা কব্জি চেপে ধরল দীনা।

'কি হলো?' জানতে চাইল রানা। জানালা দিয়ে লাইটপোস্টের আলো ঢুকছে ঘরে। দেখল, ওর কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল দীনা।

'কি করছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা। ঢোক গিলল একটা।

'আমাকে আরও সুন্দর করতে চেয়েছিলে, মনে নেই?' দীনার গলায় চাপা কৌতুক।

হাসল রানা। 'তার আগে দু'চোখে কিছু স্বপ্ন ভরে নিলে কেমন হয়? শ্যাম্পেন চলবে?'

'চলবে।'

ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসল বিছানায়।

শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে হোটেলের সামনে দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে। হঠাৎ কর্কশ একটা গলা শোনা গেল, 'হল্ট!'

মোবাইল পেট্রল, ভাবল রানা। গাড়িটা থামল। একটু পর আবার চলে গেল সেটা।

রানার মনে অনেক প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টা হলো, চোটা কোথায়? ব্যাংকক এখন একটা ফাঁদ। এই ফাঁদের ভেতরই কোথাও আছে সে। বন্দীকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার প্ল্যান তৈরি করছে। দিনের বেলা, হাজার হাজার লোক আর পুলিসের চোখের সামনে থেকে প্রিন্সকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে যে লোক, টহল পুলিস আর রোড ব্লক কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তাকে?

'সকাল হয়ে গেছে?'

গাড়ির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে দীনারও।

'প্রায় চারটে,' বলল রানা।

দু'হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরে ওর কোলে মাথা তুলে দিল দীনা। ঘরের ভেতর আলো-আঁধার। রানার হাত অবাধ্য হয়ে উঠতে চাইল।

'আই!' খিল খিল করে হেসে উঠল দীনা। 'সুড়সুড়ি লাগে!'

একটু চুপ। 'তোমাকে নিয়ে সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন রয়েছে, সোহানা দি। আমি ওকে ঠাট্টা করে বললাম, রানার সাথে এতটা ঘনিষ্ঠ হতে বলছিস, শেষে আমি যদি ভাগ বসাই?'

'কি বলল সোহানা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল রানা।

'বলল, তারপরেও আমারটুকু ঠিকই থাকবে। তারপর কি বলল জানো?'

'কি?'

'শুনে তুমি না আবার মাথায় চড়ে বসো!'

'কি বলেছে?'

'না, থাক!'

দীনার একটা হাত চেপে ধরে একটু মোচড় দিল রানা। 'থাক মানে? বলো জলদি!'

'ছাড়ো, লাগে!' হেসে উঠল দীনা, 'বলেছে, পুরুষমানুষ, অবিবাহিত, তার ওপর মেয়েদের সাথে হরদম ওঠা বসা; ও সন্ন্যাসী হয়ে দিন কাটাবে এ আমি আশা করতে পারি না।'

চাদরটা সরিয়ে দিল রানা।

'একী হচ্ছে?'

'লাইসেন্স পাওয়া গেছে, সেটার সদ্ব্যবহার করছি...'

'আরে…কী মুশকিল… আই!'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নীনা দেখল, তার পিস্তলটা নাড়াচাড়া করছে রানা।

এত চ্যাপ্টা পিস্তল আগে কখনও দেখেনি রানা। এটা একটা অ্যাস্ট্রা কাব, বারো আউন্স, পয়েন্ট টু-টু মিনিয়েচার, তিন ইঞ্চি ব্যারেল। কাছ থেকে গুলি করার জন্যে দারুণ। হোলস্টারটা বিশেষভাবে তৈরি, মেয়েরা যাতে উরুতে বাঁধতে পারে।

কাপড় পরতে শুরু করল নীনা। কাপড় পরেই বিদায় নিল।

পাঁচটার সময় ফোন এল। উত্তম আবদুল্লা বলল, 'মনোযোগ দিয়ে শুনুন, মি. রানা।' তার গলার আওয়াজ আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা লাগল রানার কানে।

'গুরুত্বপূর্ণ হলে,' বলল রানা, 'আমাদের দেখা হওয়া উচিত। সেটাই নিরাপদ।'

টোটা গা ঢাকা দিয়ে আছে, আড়িপেতে শোনার সুযোগ তার আছে বলে মনে হয় না, তবু নিয়ম মেনে চলতে চায় রানা।

'গুরুত্বপূর্ণ,' বলল আবদুল্লা, 'কিন্তু দেখা করার সময় নেই। শুনুন, প্লীজ। আমার লোকেরা রাত-দিন কাজ করছে, তাদের একজন এইমাত্র টেলিফোনে রিপোর্ট করেছে আমাকে। আপনার সাথে যাকে জিমনেশিয়ামে পাঠিয়েছিলাম, আপনার মনে আছে?'

ছোটখাট হিন্দু লোকটা।

'হ্যাঁ।'

'ফেট বুরি রোডে, রেডক্রস ভবনের সিঁড়িতে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সে,' বলল আবদুল্লা। 'ব্যাপারটা জরুরী, যত তাড়াতাড়ি পারেন ওর সাথে দেখা করুন। ওখানে পৌঁছে তাকে যদি না পান, সাথে সাথে টেলিফোন করবেন আমাকে।'

'আর যদি দেখা পাই?'

'ব্যাপার কি, তার কাছেই শুনতে পাবেন।'

যোগাযোগ কেটে দিল আবদুল্লা। খানিক চিন্তা-ভাবনা করা দরকার, কিন্তু হাতে সময় নেই। যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা না গেলেও আবদুল্লার আচরণে কোথায় যেন একটা খুঁত আছে, কিন্তু তবু ফেট বুরি রোডে না যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তৈরি হওয়ার জন্যে দু'মিনিট সময় নিল রানা। যতটুকু বলার বলেছে আবদুল্লা, পরিস্থিতিটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে ও।

কাউকে ফলো করছে হিন্দু লোকটা, তার মক্কেল যদি ফেট বুরি থেকে সরে যায় তাকেও সরে যেতে হবে। তারপর, সুযোগ মত নিজের নতুন পজিশন জানাবার জন্যে টেলিফোন করবে আবদুল্লাকে। রানা ফোন করলে, আবদুল্লা ওকে হিন্দু লোকটার নতুন পজিশন জানিয়ে দেবে।

এই পদ্ধতিটাকে মিউজিক্যাল চেয়ার বলা হয়। মক্কেল থামলে ওরা সবাই বসে পড়ে, এবং ভাগ্য ভাল হলে নাগালের মধ্যে একটা টেলিফোন পাওয়া যায়।

দশ মিনিটের পথ, কাজেই হেঁটে রওনা হলো রানা। ট্যাক্সি সহ সব ধরনের গাড়ি থামাচ্ছে পেট্রল, হেঁটে গেলেই তাড়াতাড়ি হবে।

লামপিনির উত্তরে মোবাইল পেট্রলের দুটো দলকে দেখল রানা। এড়াবার জন্যে ঘুরপথ ধরল ও, পুরো দু'মিনিট বেশি খরচ হয়ে গেল, কিন্তু ওদের সামনে পড়ে গেলে কাগজ-পত্র পরীক্ষা করতে পাঁচ মিনিট সময় নিত ওরা। একই ঘটনা আবারও ঘটল প্র্যান চিট আর এরাওয়ান হোটেলের পাশে রাজা রামরীতে। আরও দু'মিনিট নষ্ট হলো। তবে, প্রায় পৌঁছে গেছে ও।

এখনও ওর পিছনে লেগে আছে লোকটা। সেই ঢাউস বেলুন। তাকে খসাতে গিয়ে আরও কয়েকটা মিনিট নষ্ট হলো। টেলিফোন হাউস পেরিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়ল রানা।

হোটেল থেকে নীনা বেরিয়ে যাবার একটু পরই কামরার জানালা থেকে লোকটাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রানা। রাতটা নীনা ওর সাথে কাটালেও, সকাল থেকে শুরু হয়েছে ঢাউস বেলুনের পালা। ওরা কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। ভালই, কিন্তু রানা যেখানে যাচ্ছে সেখানে একা পৌঁছুতে চায় ও। আবদুল্লার কথা থেকে বোঝা যায়, ওখান থেকে আবার অ্যাকশন শুরু হতে পারে।

গলিতে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল রানা। মাত্র সকাল হচ্ছে, পাঁচিল টপকে একটা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেটের পাশে গা ঢাকা দিয়ে থাকলেও, কেউ ওকে দেখতে পেল না। গলি দিয়ে হেঁটে গেল ঢাউস বেলুন। একটু পর গলির যে মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল সেই মুখ দিয়েই বেরিয়ে এল রানা, পিছনে নেই কেউ।

ফেট বুরি রোড। হেডলাইটের আলো দেখে চট করে একটা দোকানের গেটে আড়াল নিল রানা। সামনে দিয়ে চলে গেল পেট্রল কার। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করল ও, এবার সাবধানে। পুবের আকাশ আলোকিত হয়ে উঠছে, তবে রেডক্রস ভবনের সামনের রাস্তায় আলো জ্বলছে এখনও।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। পুলিস-কার ছাড়া রাস্তায় কোন যানবাহন নেই। রাস্তায় রিকশা নামতে দেরি হচ্ছে আজ। শহরের নিজস্ব নিয়মে ভাঙন ধরেছে, দিনটা শুরু হতে যাচ্ছে ইতস্তত আর দ্বিধার ভাব নিয়ে।

আশপাশে কোথাও নিচু আকাশে একটা হেলিকপ্টার উড়ছে।

নিজের অজান্তেই এক থেকে ষাট পর্যন্ত গোণা শেষ করল রানা। দু'মিনিট পর ঠিক করল, আর এক মিনিট দেখে ফোন করবে আবদুল্লাকে।

চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। রাস্তার ওদিকে ছোট্ট একটা পার্ক। গাছের পাতা ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল একটা হাত। হাতছানি দিয়ে ডাকছে রানাকে।

কোন কারণে রানার কাছে লোকটা আসতে পারছে না। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাস্তা পরীক্ষা করল রানা, তারপর পেরোল। বাগানের ভেতরটা শান্ত। উঁচু একটা মন্দিরের গম্বুজে কচি রোদের হাসি। হিন্দু

লোকটাকে একা দেখল রানা।

'লোকটা চলে যেতে পারে এই ভয়ে নড়তে পারিনি আমি,' বলল সে।

রানা দেখল, পাতার ফাঁকে চোখ রেখে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে রয়েছে আবদুল্লার ইনফরমার। রাস্তার ওপারে সরু একটা গলি, সেই গলির ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন চীনা। এখান থেকে দূরত্ব হবে পঞ্চাশ গজের মত। তবু লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল রানা।

টোটার লোক।

দশ

রোদের ছোঁয়া পেয়ে উন্মুক্ত হলো মুকুল। পানির ওপর ঝুলে রয়েছে একগোছা অর্কিড, পানিতে ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছে কয়েকটা পদ্ম। তাজা বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে ক্যামেলিয়ার গন্ধে। আশপাশে অসংখ্য রঙচঙে, খুদে দৃশ্য আর আওয়াজ। গুন গুন করছে একটা মৌমাছি, একটা পাতা ঝরল। গাছের উঁচু ডালে বসে মিষ্টি সুরে গান গাইছে নাম না জানা পাখি। কিন্তু এসব উপভোগ করার সময় নেই রানার। চীনা লোকটা একটু সরে দাঁড়াল দেখে তাকে চোখে রাখার জন্যে ওকেও একটু সরে দাঁড়াতে হলো।

আধঘণ্টা হয়ে গেছে হিন্দু লোকটাকে বিদায় দিয়েছে ও।

এই চীনা লোকটাকে টোটার সাথে গাড়িতে দেখেছিল রানা। এখন গলির একটু ভেতরে দাঁড়িয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে সে। তার ছটফটে ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, যার অপেক্ষায় রয়েছে পৌঁছুতে দেরি করছে সে। বড় রাস্তায় পেট্রল পুলিসের ভয় আছে, ওই গলি ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই তার।

দেখতে পেয়ে লোকটাকে যদি জেরা করে পুলিস, তারপর গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায়, তাহলেই বিপদ। লোকটাকে হারালে টোটাকেও হারাবে রানা। প্রিন্সের কাছে পৌঁছুনোর আশা ছেড়ে দিতে হবে।

পুলিসের হাতে ধরা পড়লেও এই লোক মুখ খুলবে না। টোটা তার সেলে আজেবাজে লোক নেয়নি, মুখ খোলার আগে ডেথ-পিল গিলে ফেলবে।

এরকম যে ঘটতে পারে, সেটা রানা আগেই ধারণা করেছিল। এক এক করে দলের লোকদের বাইরে পাঠাচ্ছে টোটা, তারা যাতে তার জন্যে পালাবার একটা রাস্তা তৈরি করতে পারে। পুলিস যদি বাদ না সাধে, টোটার এই লোকেরা আন্ডারগ্রাউন্ডের অনেকের সাথে যোগাযোগ করবে, ঘুরে ফিরে দেখবে রোড-ব্লকের কোথায় কি দুর্বলতা আছে না আছে।

দিনটা গরম হয়ে উঠছে। রাস্তায় যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে।

একটা গাড়ি আসছে। গলির মুখে বেরিয়ে এসে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে চীনা লোকটা, রানার দিকে পিছন ফিরে। সম্ভবত এই গাড়িতেই আছে তার কন্ট্যাক্ট।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল রানা। গাড়িতে উঠে কন্ট্যাক্টের সঙ্গে চলে যাবে চীনা লোকটা। কিন্তু কোনমতেই তা ঘটতে দিতে পারে না ও। যে কোন মূল্যে এই লোককে চোখে চোখে রাখতে হবে। শুধু তাহলেই প্রিন্সের কাছে পৌঁছুবার আশা করতে পারে ও। ভয়ঙ্কর ঝুঁকি আছে, তবু চরম ও একমাত্র সিদ্ধান্তটাই নিল রানা। মাত্র দু'সেকেন্ড চিন্তা করেই ঠিক করে ফেলল, সে-ও উঠবে গাড়িতে।

নিঃশব্দে এগোল রানা। গলির সামনে, রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে পড়ছে গাড়িটা। সাত সীটের কালো একটা লিংকন সিডান। পার্কের কিনারায় পৌঁছে গেটের কাছে সুযোগের অপেক্ষায় থাকল রানা।

জানে, স্পেশাল ইউনিট ওকে হারিয়ে ফেললেও, ওর খোঁজে সম্ভাব্য সব জায়গায় ঢুঁ মারবে তারা। ভাগ্য ভাল হলে, ওদের কারও চোখে পড়ে যেতে পারে ও।

রাস্তা পেরিয়ে লিংকনের পিছনের সীটে উঠল চীনা লোকটা। আবার গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

স্পীড বেশি নয় এখনও, পার্কের গেট ঘেঁষে চলে যাচ্ছে লিংকন, লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। হিসেবে কোন ভুল হয়নি, এক ঝটকায় দরজা খুলেই গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে ড্রাইভার, এই সময় পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলল ড্রাইভার।

'থেমো না!' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল চীনা লোকটা।

তার বয়স বেশি নয়, টোটার চেয়ে কমই হবে। কোমরটা সরু, কাঁধ দুটো চওড়া, আধ বোজা চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। জীবনের কোন ঘটনাই যেন এই লোককে চঞ্চল করতে পারে না। মৃদুকণ্ঠে রানাকে বলল সে, 'সাবধান, প্লীজ!'

ওদের দু'জনের মাঝখানে আর্ম রেস্টটা নামিয়ে ফেলা হয়েছে। সেদিকে চোখ পড়তে রানা দেখল, চীনার হাতে একটা স্প্রিং গান, ওর লিভারের দিকে তাক করা।

স্প্রিং গানের সুবিধে হলো, প্রায় কোন শব্দ করে না। শহরের যা অবস্থা, টোটার লোকদের কাছে স্প্রিং গান থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। চীনার পকেটে হয়তো পাউডার গানও আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে স্প্রিং গানটাই দরকার তার। এর রেঞ্জ বেশি নয়। দশ ফিট কিংবা তার বেশি দূর থেকে ফায়ার করলে কোট ফুটো করবে কিনা সন্দেহ। এমন কি সাত ফিট থেকে ফায়ার করা হলেও টার্গেটের পরনে যদি ওভারকোট থাকে, শরীরে হয়তো আঁচড়টিও লাগবে না। তবে স্প্রিং গান দিয়ে মানুষ খুন করা সম্ভব, যদি চারফিটের মধ্যে থেকে ফায়ার করা হয়।

'বাঁকের কাছে পৌঁছে পার্কটাকে চক্কর দাও,' ড্রাইভারকে বলল চীনা।

বাঁক নিয়ে কায়াথাই রোডে ঢুকল লিংকন, রামা কোর্টের দিকে যাচ্ছে। সুযোগের সন্ধানে আছে রানা। চীনাকে কাবু করতে পারলে তার কাছ থেকে

মেটার ঠিকানা আদায় করা সম্ভব হতে পারে। লোকটার সাথে যদি ডেথ-পিল না থাকে, পুলিসের সাহায্যও নিতে পারবে ও।

থাই ভাষায় কথা বলল টীনা, 'মেয়েটা কোথায়?'

উত্তর দিতে দেরি করলে মনে করবে মিথ্যে কথা বলা হলো, তাই সাথে সাথে জবাব দিল রানা, 'সেফ হাউসে।'

ওরা একই গ্রুপের বলে ধরে নিয়েছে টীনা। সেটাই স্বাভাবিক। ওর সাথে দীনাকে দেখেছে ওরা। দু'জনেই বাংলাদেশ দূতাবাসে আসা যাওয়া করেছে।

এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করার কথা ভাবছে লোকটা।

গুদামের চেয়ে সুই সুক থী কাছে, কিন্তু নড়াচড়ার জায়গা বেশি ওখানে। টীনাকে কাবু করার একটা সুযোগ মিলেও যেতে পারে।

'সেফ হাউসটা কোথায়?'

'সুই নাম্বং নয়-এ,' বুক ভরে দম নিয়ে বলল রানা। পরমুহূর্তে ডান হাতে টীনার কব্জি লক্ষ্য করে চপ মারল।

সাপের চেয়েও ক্ষিপ্র এই লোক। রানার ডান হাত নড়ে উঠতেই বিদ্যুৎগতিতে স্প্রিং গান ধরা হাতটা সরিয়ে নিয়েছে সে, তার আগে ট্রিগার টিপতে ভুল করেনি। অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে।

রানার ডান হাতের তালুর কিনারা থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করল। সুচের মত চোখা খুদে বর্শা খানিকটা মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'সাবধান, প্লীজ।' ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে টীনা। এবার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে, 'সুই নাম্বং নয়-এ চলো।'

একটা পুলিস কার ওভারটেক করল লিংকনকে। একটানা অনেকগুলো সেকেন্ড কড়া চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল দু'জন পুলিস। রানার পাঁজরে স্প্রিং গানের ব্যারেল চেপে ধরল টীনা। নড়ল না রানা। লিংকন আর সামনের একটা গাড়ির মাঝখানে চলে গেল পুলিস কার। খানিক পর সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল সেটা।

'কত নম্বর সুই নাম্বং নয়?'

নম্বরটা বলল রানা। 'একটা গুদাম।'

ড্রাইভারকে আবার নির্দেশ দিল টীনা।

ধীরে ধীরে, লোকটার চোখে চোখ রেখে, ডান হাতটা সামনে বাড়াল রানা, রক্ত যাতে ট্রাউজারে না পড়ে কার্পেটে পড়ে। নিঃশব্দে হাসল লোকটা, মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইল, এতে তার আপত্তি নেই।

গুদামের কাছে পৌঁছে জানতে চাইল লোকটা, 'কোন দরজাটা ব্যবহার করো?'

'গলির ভেতরেরটা।'

গলিটার আর কোন বেরুবার রাস্তা নেই। লোকটার কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে লিংকনকে পিছু হটিয়ে গলির ভেতর নিয়ে এল ড্রাইভার। এটাই সাধারণ নিয়ম। বলা যায় না, যদি কোন সঙ্কট দেখা দেয়, গাড়িটা সঠিক দিকে মুখ করা থাকল। লোকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে, এই সাবধানতা সেজন্যে নয়। তার

আচরণে ভাবাবেগের কোন লক্ষণই দেখল না রানা। সেটাই ওকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বার বার প্লীজ শব্দটা ব্যবহার করছে সে, এ থেকে বোঝা যায় আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই তার।

ভি-এইট ইঞ্জিনের আওয়াজ সরু গলির ভেতর অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল। গুদামের দরজা ঘেঁষে থামল লিংকন। ড্রাইভারকে বলা হলো, 'ওকে নিয়ে নেমে যাচ্ছি, ঠিকানায় ফিরে যাও তুমি। ওদেরকে বলবে, এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি।' রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'দরজায় কি তালা আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'চাবি?'

'আছে।'

'তালা খুলে ভেতরে ঢোকো, প্লীজ,' বলল লোকটা। 'পিছনেই আছি আমি। সাবধান।'

ওদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেখল তারা। রঙচঙে পুরুষ আর লেজ বিশিষ্ট মেয়ে ঘুড়ি। সবক'টা ঝুলছে অনড়। বাতাস নেই।

পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনল রানা। ইঞ্জিনের শব্দ একটু বাড়ল, তারপর দূরে সরে যেতে শুরু করল। লিংকন চলে যাচ্ছে।

আরও ভেতরে ঢুকে এল ওরা।

'থামো,' বলল টীনা।

তার পায়ের আওয়াজ শুনল রানা। পিছিয়ে যাচ্ছে। চার পা পিছাল, পাঁচ পা। কেন, বুঝতে পারল রানা।

'আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াও, প্লীজ।'

ঘুরল রানা। হাতের অস্ত্র বদলেছে টীনা। রানার দিকে তাক করা রয়েছে একটা পয়েন্ট থ্রী এইট, সাইলেন্সার লাগানো।

'কোথায় সে?' দীনার কথা জিজ্ঞেস করল লোকটা।

স্কাইলাইট দিয়ে রোদ ঢুকছে। রানার ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে টীনা।

পাঁচ পা দূর থেকে কিছুই করার নেই রানার। ও যদি লাফ দেয়, গুলি করবে। এমন কিছু বলতে হবে টীনাকে, শুনে খুন করার চিন্তা বাদ দিয়ে ওকে নিয়ে যেন বাইরে বেরিয়ে যেতে রাজি হয়। 'এখানে নেই সে,' বলল ও। বিশ্বাসযোগ্য কিছু বানিয়ে বলতে হলে চিন্তা-ভাবনার জন্যে একটু সময় দরকার।

'তুমি বলেছিলে আছে।' কোনরকম চোটপাট দেখাল না টীনা। অবাকও হয়নি। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চারদিক দেখে নিল সে। লাফ দিয়ে পড়ার জন্যে যতটা সময় দরকার রানার, তার অর্ধেকেরও কম পাওয়া গেল। 'কখন আসবে, সেজন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারি না।' আবার সরাসরি রানার দিকে ফিরল সে। 'আমার ওপর হুকুম আছে, যদি সম্ভব হয়, তোমাকে দেখামাত্র গুলি করতে। একই নির্দেশ মেয়েটার জন্যেও। কিন্তু হাতে আমার সময় নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তার আয়ু আছে, আমি কি করব!'

শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়া। মনে হলো স্যুটের ভেতর ওটা

একটা ডেথ-মেশিন, রক্ত-মাংসের মানুষ নয়।

'জরুরী তিনটে খবর আছে আমার কাছে,' বলল রানা। 'টোটা এগুলো পেলে বর্তে যাবে। এক, পুলিস একটা প্ল্যান তৈরি করেছে।'

'পুলিস?'

রানার মনে হলো, লোকটা একটা টাইম বোমা। ওটার টিক টিক থামাবার কোন উপায় নেই। যতই বোঝাবার চেষ্টা করা হোক, থামানো যাবে না একে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওরা এমন একটা প্ল্যান তৈরি করেছে, টোটার শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এই প্ল্যানের বিস্তারিত সব জানি আমি। তৈরি করতে আমি ওদেরকে সাহায্য করেছি।'

কিন্তু রানার কথা শুনছে না লোকটা। রানার কাছাকাছি চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখে নিল।

'আরেকটা জরুরী খবর হলো,' আবার শুরু করল রানা, 'সউদী ইন্টেলিজেন্স এরই মধ্যে ন্যাট চাপালের সাথে যোগাযোগ করেছে।'

'তোমার মত মানুষ খুব কমই দেখা যায়,' বলল টীনা। 'বুঝতে পারছ সময় ঘনিয়েছে, তবু আশা ছাড়তে রাজি নও।'

'তোমার হাতে আমাকে যদি মরতে হয়,' বলল রানা, 'টোটার হাতে তোমাকেও মরতে হবে। আমি মারা যাবার পর সে যদি জানে এসব খবর আমি তাকে দিতে পারতাম, ধড় থেকে তোমার মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলবে সে। পুলিস তাকে ধরবেই, তখন সবকথাই জানবে সে। চাপাল কি বলেছে জানো?'

'শুনতে চাই না।'

'সে বিনিময় হতে রাজি নয়...'

'ওই বাক্সটার পাশে গিয়ে দাঁড়াও, প্লীজ,' অনুরোধ করল লোকটা। হাতের রিভলভার নেড়ে রানার সবচেয়ে কাছের কাঠের বাক্সটা দেখাল সে।

রানার বাঁ দিকে ওটা। গায়ে যথেষ্ট শক্তি রাখে টীনা, রানার লাশটা তুলে বাক্সে ভরা তার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু খাটনিটা খাটবে কেন? তাছাড়া, আবর্জনা ছুঁতে কারই বা ভাল লাগে!

'তুমি একটা হাবা নাকি?' এমন ভাব দেখাল রানা, যেন সাংঘাতিক রেগে গেছে। 'নিজেদের কিসে ভাল হবে, বোঝো না? ইসরায়েল এই কাজের জন্যে টোটাকে যত টাকা দিচ্ছে, তার ডবল টাকা দিয়ে প্রিন্সকে ফিরিয়ে নেবার প্রস্তাব আছে, সে কথা জানো?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'জানো না! জানবে কোত্থেকে, প্রস্তাবটা আমার মাধ্যমে টোটার কাছে পৌঁছুবার কথা। এরপরও কি তুমি আমাকে টোটার কাছে নিয়ে যেতে রাজি নও?'

'বাক্সের পাশে, প্লীজ,' আবার রিভলভার নাড়ল টীনা। 'বাক্সের এই দিকে।'

লোকটার ওপর সত্যি সত্যি রেগে উঠল রানা। এত যুক্তি খাটিয়ে খবরগুলো বানাল ও একটাও ব্যাটাকে স্পর্শ করল না!

পরিস্থিতিটা দ্রুত জরিপ করে নিল সে। বাক্সের পাশে না দাঁড়ালে গুলি করবে। বাক্সের পাশে দাঁড়ালেও গুলি করবে। ও যদি কথা বলে সময় পেতে চায়, তাহলেও গুলি করবে। ও যদি লাফ দেয়, লাফটা দেয়া হবে প্রথম বুলেটটাকে লক্ষ্য করে। ও ধরাশায়ী হবার আগেই দুই আর তিন নম্বর বুলেট ঠাঁই করে নেবে ওর কলজের ভেতর। উঁহু, কোন আশা নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে বাক্সটার দিকে তাকাল রানা।

'যাও বলছি!' সামান্য তীক্ষ্ণ শোনাল লোকটার গলা। তাতে নির্দেশের সুর নেই। আরও খারাপ—অধৈর্যের সুর।

সরে এসে বাক্সের পাশে দাঁড়াল রানা। আনুগত্য প্রকাশের জন্যে নয়, আরও দু-চারটে সেকেন্ড পাওয়া যাবে এই আশায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এই দু'চার সেকেন্ডে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

লোকটার রিভলভার ধরা হাত শক্ত হয়ে উঠল। কনুই থেকে ওপরের অংশটা সেঁটে গেল পাঁজরের সাথে। গুলি করতে যাচ্ছে, এ তারই লক্ষণ।

'ইচ্ছে হলে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারো।'

'ধন্যবাদ,' ঠাণ্ডা মাথায় বলল রানা। 'আমি খোলাই রাখব।' লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে ও।

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'বেশ।'

রানা ধারণা করল, গুলি হতে আরও পাঁচ সেকেন্ড দেরি আছে। গভীর দৃষ্টিতে রানাকে লক্ষ করছে লোকটা। একজন মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় আরেকজন মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, গুলি করার আগে তার শিকারের মনের অবস্থা চোখ দেখে বুঝতে চাওয়াটা স্বাভাবিক।

কিন্তু পাঁচ সেকেন্ড পর নয়, মাত্র দু'সেকেন্ড পরই গুলি হলো। সাইলেন্সার লাগানো থাকায় তেমন আওয়াজ হলো না। তবে হালকা নুড়িগুলো কেঁপে উঠল একটু।

এগারো

রুম সিক্সে তিনজন অচেনা লোককে দেখল রানা। ওকে ঢুকতে দেখে সাথে সাথে তাদেরকে বিদায় করে দিল সোহেল। কিন্তু এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল সোহেল, কান থেকে সেটা আর নামতেই চায় না। মাঝেমধ্যে নজর ফেলছে রানার দিকে, ভাবলেশহীন চেহারা। এক সময় রিসিভার নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ সুরে বলল, 'তোকে আমি খুঁজছিলাম।'

'কোন খবর আছে?'

'হ্যাঁ,' আবার রানার হাতের দিকে তাকাল সোহেল। 'তোর হাতে ব্যান্ডেজ কেন? কি হয়েছে?'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'বিনিময়ের প্রস্তাব ইসরায়েল দিয়েছে?'

দেরাজ খুলতে যাচ্ছিল সোহেল, হাত দুটো স্থির হয়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে, বলল, 'লীনা তোকে সব কথা বলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'প্রস্তাবটা যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে দিয়েছে ইসরায়েল,' বলল সোহেল। 'এখানের সউদী দূতাবাস একটা ফটোকপি পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে।' দেরাজ থেকে এক শীট কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'পড়।'

কাগজটা নিল রানা। ভাঁজ খুলে দেখল কোন হেডিং নেই। লেখাগুলো ইংরেজীতে টাইপ করা। বাংলা করলে অর্থ দাঁড়ায়:

'ইসরায়েল সরকার এই মর্মে সউদী আরবকে জানাচ্ছে যে এখনও পরিচয় জানা যায়নি এই রকম একটি পক্ষ প্রিন্স ফরহাদকে স্থানান্তরের একটি প্রস্তাব ইসরায়েল সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছে। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল যদি একশো ষাট মিলিয়ন হঙকঙ ডলার দিতে রাজি হয় তাহলে প্রিন্স ফরহাদকে তার হাতে তুলে দেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত পরিষ্কার এবং স্পষ্ট ভাবে ইসরায়েল সরকার জানাতে চায় যে এই প্রস্তাব সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, এবং থাকার কথাও নয়। তবে, ব্যাংকক পরিস্থিতি নিয়ে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে ইসরায়েল আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং সউদী আরবের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই পরিস্থিতিতে সউদী আরব যদি অনুরোধ এবং প্রস্তাব করে তাহলে ইসরায়েল নিজের তহবিল থেকে একশো ষাট মিলিয়ন হঙকঙ ডলার দিয়ে প্রিন্স ফরহাদকে উদ্ধার করার ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখতে রাজি আছে। সেক্ষেত্রে প্রিন্স ফরহাদকে সউদী আরব ইসরায়েলের কাছ থেকে বুঝে নেবে, একশো ষাট মিলিয়ন হঙকঙ ডলার এবং ন্যাট চাগাল নামে একজন ইসরায়েল-ভক্তের বিনিময়ে। সউদী আরব অনুরোধ করলে ইসরায়েল তাকে জানাবে, বিনিময় অনুষ্ঠান কোথায় অনুষ্ঠিত হবে।

এখানে বিশেষ ভাবে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রাজনৈতিকদর্শন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত-বিরোধ থাকলেও মানবকল্যাণের মহৎ আদর্শ সমুন্নত রাখার জন্যে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত অন্তত সঙ্কটের সময় পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করা। ইসরায়েল সরকার এই নীতিতে বিশ্বাসী। তার একান্ত কামনা: সকলের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলার অবস্থা হয়েছে সোহেলের।

মুখ তুলল রানা। 'হুঁ।'

'প্রস্তাবটা রিয়াদকে দেয়া হয়েছে আজ শেষ রাতে,' সোহেলের মুখ থেকে কথার তুবড়ি ছুটল। 'সাথে সাথে জরুরী মীটিং ডেকে দ্রুত সিদ্ধান্ত

নিয়েছে সউদী সরকার। প্রিন্সকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব বলে মনে হয়নি তাদের, তাই ইসরায়েলের প্রস্তাব মেনে না নেয়ারও কোন প্রশ্নই ওঠেনি। হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, বিনিময় হবে। সউদী সরকার প্রিন্সের নিরাপত্তার কথা ভেবে কোন রকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিতে রাজি নয়। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ওরা। অনেক কাজ, সময়ও লাগবে অনেক।'

মনে মনে ইসরায়েলের প্রশংসা করল রানা, গোটা ব্যাপারটা চমৎকার সাজিয়েছে ওরা। বলতে চাইছে, প্রিন্সকে কিডন্যাপ করেছে ইসরায়েল নয়, অজ্ঞাতনামা একটা পক্ষ। কাজটা হয়েছে থাইল্যান্ডে, ইসরায়েলের মাটিতে নয়। এই কিডন্যাপিঙের একমাত্র লক্ষ্য, মোটা টাকা আদায়। এর সাথে ন্যাট চাগাল বা ইসরায়েলের কোন সম্পর্ক নেই।

বাণিজ্যিক দিক থেকেও এটা একটা নিখুঁত সেট-আপ। একশো ষাট মিলিয়ন হঙকঙ ডলার দিয়ে কিডন্যাপারদের কাছ থেকে প্রিন্সকে উদ্ধার করবে ইসরায়েল, সেই টাকা ফেরত পাবে সউদী আরবের কাছ থেকে। মাঝখান থেকে বিনা পয়সায় ঘরে ফিরে আসবে চাগাল। আর চাগালকে ফেরত পাওয়া মানে এমন একটা আইটেমের ওপর সায়েন্টিফিক ডাটা লাভ করা যার সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যের সবগুলো মুসলিম রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করার মত ভয়ঙ্কর অস্ত্র তৈরি করতে পারবে ইসরায়েল।

'তবু, কতটা সময়?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও আমরা জানি না। লাওস সীমান্তে মেকং নদীর কাছে একটা জায়গা আছে যেখানে মাফিয়াদের দারুণ প্রতাপ। চোরাচালানীরা ওখানে নাকি নিজেদের প্রশাসন পর্যন্ত চালু করেছে। আমাদের বিশ্বাস প্রিন্সকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রিন্স ওখানে পৌঁছেছেন, এই খবর পাবার সাথে সাথে সরকারীভাবে ইসরায়েলের প্রস্তাব মেনে নেবে সউদী আরব।'

'তার মানে প্রিন্সকে ব্যাংকক থেকে উদ্ধার করার একটা সুযোগ এখনও আছে।'

'প্রশ্ন হলো, সম্ভব কিনা,' বলল সোহেল। 'আমাকে জানানো হয়েছে, রিয়াদ সেন্ট্রাল জেল থেকে চাগালকে বের করে এরই মধ্যে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে। কাজ কত দ্রুত এগোচ্ছে, এ থেকেই বুঝে নে।'

'আমি জানতে চাই আমাকে তোর কি বলার আছে।'

'ভোর থেকে দু'বার সরাসরি লাইনে কথা বলেছি ঢাকা হেড-কোয়ার্টারের সাথে,' বলল সোহেল। 'হেডকোয়ার্টার চাইছে, বিনিময়ের আগে প্রিন্সকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছু যেন করি আমরা।'

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল সোহেল। 'স্পিকিং।' এক সেকেন্ড শুনে রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

রিসিভার নিয়ে কানে তুলল রানা। লীনার মিষ্টি গলা বলল, 'তোমার কল, রানা।'

এক সেকেন্ড পর একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, 'কাজ হয়েছে, মি. রানা?' উত্তর আবদুল্লা নিজের পরিচয় দিল না।

'না,' বলল রানা।

'কেন...?'

'সুযোগটা আমি নষ্ট করে ফেলি।' লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র থাকতে পারে, তাই সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়।

'আমার লোক কোন ভুল করেনি তো?'

'না,' বলল রানা। 'ভুলটা আমার হয়েছে।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহেল।

'ব্যাপারটা এখন আপনার জন্যে অসম্ভব কঠিন হয়ে গেল,' বলল আবদুল্লা। 'ওরা এখন মরিয়া। আরও ইনফরমেশন পাব বলে আশা করছি আমি। যদি পাই, সাথে সাথে দেবার জন্যে আপনাকে পাব তো?'

'পাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

দরজায় নক করল কেউ, সেদিকে এগোল সোহেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

'কে?' দরজার কাছ থেকে জানতে চাইল সোহেল।

'উ আ।'

'ডাকল নাকি?'

'না।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল। একা হতেই ফোনের রিসিভার তুলে দীনাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো রানার, কেমন আছ? দীনা ভাল আছে, জানে ও। আসলে কেন জানি গলার আওয়াজটা আবার শুনতে ইচ্ছে করল ওর।

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকাল রানা। পুলিস সার্জেন পাঁচটা সেলাই করেছে হাতে। প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলেছে রানা, ধারাল কাঁচের ওপর হাত পড়ে গিয়েছিল।

গুদামে যা ঘটেছে, আবার ছবির মত ভেসে উঠল চোখের সামনে। মৃত্যু একেবারে কাছে চলে এসেছিল বলেই হয়তো মনের ওপর ছাপ পড়েছে এত স্পষ্ট। ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল চীনা, তার ঠিক পিছনেই ছিল একটা রঙচঙে ছুঁড়ি। তাই একের পর এক তিনটে মুখ দেখতে পায় ও।

গুলি করার আগের মুহূর্তে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল চীনা লোকটা, চেহারায় ছিল চাপা একটা ভাব। কিন্তু পড়ে যেতে শুরু করতেই চেহারায় ফুটে উঠেছিল অবাক বিস্ময়। পড়তে সময় নেয় সে। তার ঠিক পিছনেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মুখটা। রঙচঙে ছুঁড়ির মুখ, গালভরা হাসিতে উজ্জ্বল। চীনা লোকটার পতন দেখার জন্যে ছুঁড়ির কিনারা থেকে বেরিয়ে আসে আরও একটা মুখ—দীনার। সেই মুহূর্তে কুঁচকে ছিল তার অবয়ব। লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় রানা। দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলে। চোখ বন্ধ

করে রানার কাঁধে মাথা রাখে দীনা। তার সারা শরীর একটু একটু কাঁপছিল।

পড়ে গিয়ে চীনা লোকটা আর নড়েনি। ঘাড়ের পিছনের ফুটো থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। দীনার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেয় রানা।

ধাক্কাটা সামলে উঠতে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি দীনার। পায়ে হেঁটে দূতাবাসে আসে ওরা, প্রচুর সময় নিয়ে। দীনার একটা হাত সারাক্ষণ ধরে ছিল রানা। আসার পথে একটা পার্ক পড়েছিল, ম্যাগনোলিয়ার নিচ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম মুখ খুলেছিল দীনা। 'ভোরের দিকে মাহবুব ফোন করে আমাকে জানাল, টেলিফোন হাউসের কাছে তুমি ওর চোখে ধুলো দিয়েছ। কাজেই ইমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করতে হয় আমাকে। মাহবুবকে পাঠাই তোমার হোটেলে, মিলনকে পাঠাই পুই সুক খী-তে।'

'আর তুমি আসো গুদামে।'

'পৌঁছে দেখি লিংকনটা পিছু হটে গলির ভেতর ঢুকছে, তাই সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকি আমি।' হাঁটা থামিয়ে রানার ডান হাতটা আরেকবার পরীক্ষা করেছিল সে। 'সেলাই করতে হবে। চলো, আগে পুলিস হাসপাতালে যাই।'

হাসপাতালে যাবার পথে রানা বলেছিল, 'আমার একটা ভুল ভেঙেছে।'

'কি রকম?'

'স্পেশাল ইউনিটের ধারণাটা যার মাথা থেকেই বেরিয়ে থাকুক, এর যে দরকার আছে একটু আগে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। ও, ভুলেই গেছি—অসংখ্য ধন্যবাদ, দীনা। সময়মত তুমি না পৌঁছুলে...'

'তোমার ধন্যবাদের নমুনা সম্পর্কে আমার ধারণা আছে,' গুদাম থেকে বেরুবার পর সেই প্রথম হাসল দীনা। 'শুধু মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না।'

পুলিস হাসপাতাল আর দূতাবাস একই রোডে। সার্জেন ওদেরকে আধ ঘণ্টার বেশি দেরি করায়নি।

দশ মিনিট পর ফিরে এল সোহেল। ফিরেই জানতে চাইল, 'আবদুল্লা কি বলল তোকে?'

'খোঁজ করলেই যেন আমাকে পায়।'

'কাজের লোক,' প্রশংসা করল সোহেল। 'খবর জোগাড় করার অনেক ব্যবস্থা আছে তার।'

'জানি,' গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'আজ সকালে একটা ক্লু দিয়েছিল আমাকে। কিন্তু আমি সেটা নষ্ট করে ফেলেছি।'

টেবিলের সামনে স্থির হয়ে গেল সোহেল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'কি ঘটল?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিছু লাভ হয়নি। কোপঠাসা হয়ে পড়েছিলাম। একটা লাশ।'

সাথে সাথে রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সোহেল। 'পুলিস গোলমাল করবে? প্রোটেকশন দরকার?'

রানা জানে, প্রয়োজন দেখা দিলে থাইল্যান্ড থেকে গোপনে ওকে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে সোহেল। 'না।'

ফোনের দিকে হাত বাড়াল সোহেল, রানা আবার বলল, 'হাসপাতাল থেকে লোকাল এস. বি.-কে রিপোর্ট করেছি।'

একটা চেয়ার টেনে বসল সোহেল। 'খুলে বল দেখি।'

সংক্ষেপে সারল রানা।

রানা থামতে সোহেল বলল, 'ব্যাংককে লিংকন খুব বেশি নেই। পুলিস সম্ভবত পেয়ে যাবে। তোর রিপোর্টে লাশ ছিল?'

'না। এখুনি ওদেরকে কিছু জানাতেও চাই না।'

'কেন?'

'ওদিকে আরও কিছু কাজ আছে আমার,' বলল রানা। 'ঘণ্টা কয়েক সময় দে, তারপর জানাস।' হাতঘড়ি দেখল ও। লিংকনের ড্রাইভারের সাথে চীনা লোকটার শেষ কথা হয়েছে দেড় ঘণ্টা আগে।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল সোহেল, বলল, 'ঠিক আছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সময় পেলেই রিপোর্ট করব।'

'কিন্তু আবদুল্লা যদি খোঁজ করে?'

'যতক্ষণ না রিপোর্ট করি আমি, ওকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা।

রানার দিকে ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সোহেল জানতে চাইল, 'কোন ক্লু পেয়েছিস, রানা?'

'ঠিক জানি না।'

'আমাদের হাতে সময় আছে মোটামুটি আটচল্লিশ ঘণ্টা...'

'কোত্থেকে পেলি এই হিসেব?'

'রিয়াদ থেকে ব্যাংকক, আর এখান থেকে লাওস সীমান্তে চালানকে নিয়ে যেতে ওই রকম সময়ই লাগবে,' বলল সোহেল। 'ব্যাপারটা টোটাও জানে। ইসরায়েলের প্রস্তাব সউদী আরব মেনে নেবে, সবাই সেটা জানে। এই ব্যাপারের সাথে যারা জড়িত তারা সবাই এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাওস সীমান্তে পৌঁছুতে চাইবে।'

'হ্যাঁ। টোটা।'

'আজ কিংবা কাল, ব্যাংকক থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে প্রাণপণ একটা চেষ্টা করবে সে।' রানার সাথে সাথে দরজা পর্যন্ত এল সোহেল।

'জানি,' বলল রানা। 'আটচল্লিশ ঘণ্টা অনেক সময়। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই করা সম্ভব। তবে, খানিকটা ভাগ্যও দরকার হবে।'

ট্যাক্সি নিয়ে গুদাম ঘরের কাছাকাছি নামল রানা। বাকি পথটুকু হেঁটে এল ও। ভেতরে ঢুকল গলির দিকের দরজা দিয়ে।

লিংকনের ড্রাইভারকে চীনা লোকটা বলছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে আস্তানায় ফিরে যাবে সে। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে, তার মানে টোটার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে চল্লিশ মিনিট আগে। আরও বিশ মিনিট কাটলে তার দৃঢ়

ধারণা হবে, সাকরেদ নিশ্চয়ই কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। কি ঘটেছে জানতে না চাওয়ার মানসিক শক্তি যদি থাকে তার, লোকটাকে ভুলে যাবে। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে থাকা অবস্থায় এ ধরনের একটা টেনশন সহ্য করা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাছাড়া, এর সাথে তার নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। লোকটা ধরা পড়ে গিয়ে সব কথা যদি পুলিসকে বলে ফেলে থাকে, তাহলে? এ-ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন টোটার মাথায় কিলবিল করবে। কাজেই, নিজের গরজেই লোকটার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে সে। আর তা জানতে হলে, গুদাম ঘরে কাউকে পাঠাতে হবে তার।

সাথে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসেনি রানা, কারণ তার কোন দরকার নেই। টোটার লোক যদি আসে, রানা এখানে আছে জানবে না সে। অপারেশনটা শুরু হবে গুদাম থেকে লোকটা বেরিয়ে যাবার সময়। তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে রানার নেই। পিছু নিয়ে শুধু আস্তানাটা দেখে আসতে চায়।

গলির ভেতর ঢুকে আশপাশটা সতর্কতার সাথে দেখে নিল রানা। কেউ নেই কোথাও। চাবি বের করে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার। টোটার লোক যদি এই দরজা দিয়ে ঢুকতে চায়, এসে দেখবে তালা লাগানো রয়েছে। তাই থাকার কথা। তালা না থাকলে সন্দেহ হবে তার।

ভেতরে ঢুকতে হলে তালা ভেঙে ঢুকতে হবে। সাথে মাস্টার কী থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাশটা নেই!

অনড় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। কাঠের মেঝেতে এখনও রক্ত জমে আছে, কালচে হয়ে গেছে রঙ। ঘুড়িগুলো নড়ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই।

বড় আকারের ঘুড়িগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। ওগুলোর কোন একটার আড়ালে কেউ যদি লুকিয়ে থাকে, বেরিয়ে আসতে চাইলে নড়াচড়া করতে হবে তাকে। আর নড়াচড়া করলেই সামান্য একটু হলেও দোল খাবে ঘুড়ি।

কোন ঘুড়িই নড়ছে না।

দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। ড্রাইভার রিপোর্ট করলেও, টোটা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। উপযুক্ত সাকরেদের হাতে মাসুদ রানা বন্দী শুনেও স্বস্তি বোধ করেনি সে, কারণ সাকরেদ একা। দেরি না করে কাউকে পাঠিয়ে দেয় টোটা। লোকটা এখানে পৌঁছে লাশ দেখে, এবং সরিয়ে নিয়ে যায়।

পৌঁছুতে একটু দেরি করে ফেলেছে রানা।

গুদাম ঘরটা ঘুরেফিরে দেখল ও। কিন্তু না, লাশ নিয়ে চলে গেছে ওরা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল ও। চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠল দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। ডাইভ দিয়ে রাস্তার ওপর পড়েই গড়িয়ে যতটা সম্ভব দূরে সরে গেল।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে শরীরের নিচে কেঁপে উঠল মাটি। একটা ইঁটের সাথে ঠুকে গেল মাথা। ইস্পাতের খুদে টুকরো ছুটে এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল গায়ের শার্ট। সারা শরীরে জখম নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলতে চেষ্টা করল রানা। পারল না।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

পাঁচ কি ছয় মিনিটের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল ও। সাইরেনের আওয়াজ শুনে বুঝল, বেঁচে আছে। উঠে বসার চেষ্টা করল। ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে পুলিস। তারা সাহায্য করল ওকে।

দু'ঘণ্টা পর বাংলাদেশ দূতাবাসে টেলিফোন করল রানা, রুম সিক্সের লাইন চাইল। কথা বলল সোহেলের সাথে। 'পুলিস হাসপাতালের প্রাইভেট ওয়ার্ডে সটকে আছি। কি সব প্রশ্ন করছে ওরা। তুই আয়, এদের অত্যাচার থেকে বাঁচা।'

এক সেকেন্ড পর জানতে চাইল সোহেল, 'এই রোডে?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি কিছু একটা কর। আমাকে এরা জ্বালিয়ে মারছে!'

'আসছি,' বলে রিসিভার রেখে দিল সোহেল। দূতাবাস থেকে তিন মিনিটের পথ পুলিস হাসপাতাল।

অপারেটিং টেবিলে প্রায় এক ঘণ্টা থাকতে হয়েছে রানাকে। জুতো ফুটো করে গোড়ালিতে ঢুকে গিয়েছিল ইস্পাতের টুকরো, কমবেশি রক্তাক্ত হয়েছে সারা শরীরই। ডান হাতের সেলাইগুলো কেটে গিয়েছিল। রানার কথায় কান না দিয়ে সার্জেন তার রিপোর্টে লিখেছে—গ্রেনেড বিস্ফোরণের শিকার। তারপর যখন শুনল, স্পেশাল ব্রাঞ্চ ওকে চেনে, মৃদু হেসে বলল, 'তাহলে তো ঝামেলা থেকে বেঁচেই গেলেন!'

এই বিস্ফোরণের সাথে কিডন্যাপিং-এর সম্পর্ক আছে মনে করে পুলিস একেবারে ছেঁকে ধরল রানাকে। সোহেল যখন এসে পৌঁছুল, ছয়জন অফিসার রয়েছে রানার বিছানার আশপাশে।

'এদেরকে বলার মত কিছুই আমার নেই, সোহেল,' বলল রানা। 'একটা ছাদের ওপর থেকে আকাশের গায়ে উঁচু হয়ে উঠতে দেখি একটা হাতকে, লাফ দিয়ে সরে যাই। এরপর প্রচণ্ড আওয়াজ। আর কিছু জানি না আমি। এখন এরা যদি একটু দয়া করে বিদায় নেয়, ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে পারি আমি।'

হাসপাতালে আসার আগে রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে খাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিকে ফোন করিয়েছিল সোহেল, তাতেই কাজ হলো। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন পেয়ে পুলিস অফিসাররা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিল। সোহেল অবশ্য কথা দিল, সময় মত পূর্ণাঙ্গ একটা রিপোর্ট দাখিল করা হবে।

সোহেলকে একা পেয়ে যা যা ঘটেছে, বিস্তারিত বলল রানা।

শুনে সোহেল বলল, 'তার মানে ওটা একটা ফাঁদ ছিল।'

'ঠিক তা নয়,' বলল রানা। 'আসল কথা, ওরা আগে পৌঁছেছিল।

জানিসই তো, চীনাদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা। লাশের ব্যাপারে ওরা খুব স্পর্শকাতর। দাফনের ব্যাপারে কোন খুঁত রাখতে চায় না। আমি ওখানে আবার যেতে পারি, টোটো সেটা আন্দাজ করে নেয়। গ্রেনেডের ব্যবস্থা সেজন্যেই রাখা হয়েছিল।'

'নিশ্চয়ই ওই ধরনের আরও ব্যবস্থা করা হবে,' বলল সোহেল।

'সম্ভবত,' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করা যখন সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন ওরা আমাকে সরাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।'

'এ থেকেই বোঝা যায়, তোর ওপর কি রকম রাগ ওদের।'

রানা শুনছে না। অন্যমনস্ক।

'কি রে, কি ভাবছিস?'

সাড়া দিল না রানা। তারপর মুখ তুলে জোর করে একটু হাসল। বলল, 'ভালই হবে, বুঝলি?'

'কি ভাল হবে? প্রলাপ বকছিস নাকি?'

'না।' চেহারাটা সিরিয়াস হয়ে গেল রানার। 'বিনিময়ের আগে প্রিন্সকে উদ্ধার করতে হলে আমাদেরকে ঝুঁকি নিতে হবে, সোহেল। আমাকে সরাবার জন্যে সত্যি যদি ওরা উন্মাদ হয়ে উঠে থাকে তাহলে ভালই হয়।'

'তোর কি মাথা খারাপ...।'

'আমরা ওদের খোঁজ পেতে চাই, ঠিক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলে যা।'

'ওদেরকে খুঁজে পাবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, ওদের জন্যে আমার ধরা পড়া। শোন, কার্পেটে কাজ হবে না, আমাকে তুই মোটা একটা কম্বল জোগাড় করে দে। আর একটা গাড়ি। প্লীজ, সোহেল, আমার সাথে তর্ক করিস না। যা বলছি কর।'

একটানা আধঘণ্টা ঘুমাল রানা। চোখ মেলে দেখল, রাত হয়ে গেছে। সোহেল নতুন কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেগুলো পরে হাসপাতাল সুপারিনটেন-ডেন্টের সাথে তর্ক করতে বসল ও। সার্জেনের অনুমতি ছাড়া রানাকে হাসপাতাল থেকে বেরুতে দেবে না সুপার, যুক্তিতে হেরে গিয়ে অনেকটা জোর-জার করেই তার কাছ থেকে একটা পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি কুইট ফর্ম আদায় করে সই করে দিল রানা। তারপর বেরিয়ে পড়ল। রাত তখন ন'টা।

পেইনকিলারের প্রভাব কমে আসার সাথে সাথে ব্যথাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, এতে লাভ হলো এই যে নিজের ব্যর্থতা ও পরাজয় আরও যেন ভাল ভাবে উপলব্ধি করতে পারল রানা।—টোটো তাকে প্রথম থেকেই গোল খাওয়াচ্ছে। রক্ত-মাংসের একটা টোপ গিলিয়েছে ওকে। ওর নাকের সামনে থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে প্রিন্সকে, যাকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল ওর ওপর। এরপর আবদুল্লা একটা সূত্র দিল ওকে, কিন্তু সেটাকেও লোভে পড়ে

করে ছাড়ল ও—টোটা আর তার দলের গোপন আস্তানা গোপনই রয়ে গেছে। এখন আর মাত্র একটা কাজ বাকি আছে টোটার, সেটা যদি করতে পারে, রানার পরাজয় চূড়ান্ত হবে। কাজটা হলো, প্রিন্সকে নিয়ে সীমান্ত এলাকায় চলে যাওয়া।

সুযোগ অবশ্য রানারও একটা আছে। এটাই ওর শেষ সুযোগ।

পুলিস ছাড়া রাস্তা বলতে গেলে একরকম খালি। টোটা যদি কোন স্নাইপার পাঠিয়ে থাকে, পুলিস কোন কাজে আসবে না। অনেক দূর থেকে গুলি করবে স্নাইপার। তার মানে, রাস্তায় বেরুনোই রানার জন্যে বিপদ। এই ঝুঁকি জেনেশুনেই নিয়েছে ও।

হাসপাতাল থেকে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামার সময়ই ঘটনাটা ঘটতে পারে। চারদিকে চোখ রেখে নামতে শুরু করল রানা। নেমেও এল। কিছু ঘটল না।

হাসপাতালের সামনে কেউ ওর জন্যে অপেক্ষা করছে না। তার অবশ্য কারণও আছে। ওরা ধরে নিয়েছে এত তাড়াতাড়ি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে না ও। ও যে বেঁচে আছে তাও হয়তো এখনও জানে না ওরা। ও মরেনি, সেটা ওদেরকে জানাতে হবে।

কাছেই দূতাবাস, কিন্তু গোড়ালি ব্যথা করছে বলে সামান্য এইটুকু হেঁটে যেতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল রানার। দৃষ্টি-সীমার মধ্যে যা কিছু নড়ল সব চেক করে দেখে নিতে হলো ওকে। ও চাইছে ব্যথা পাওয়া যেন অব্যাহত থাকে, জীবন যেন দীর্ঘায়িত হয়।

তিন মিনিট ধরে হাঁটার সময় কিছু কিছু মাথার কাজও সেরে নিল রানা। হঠাৎ করে ওরা খুন করার সিদ্ধান্ত কেন নিল? সম্ভাব্য অনেকগুলো কারণ আছে। এক, ওরা হয়তো ভেবেছে চীনাকে খুন করার আগে তার কাছ থেকে বিপজ্জনক তথ্য আদায় করে নিয়েছে ও। পুলিসকে কিছু না জানিয়ে ও নিজেই হয়তো ওদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে যাচ্ছে। দুই, টোটা আর তার সেলের হয়তো বিশ্বাস, এখন ওরা প্রিন্সকে নিয়ে ব্যাংকক থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারবে, কাজেই বিকল্প ক্যানডিডেট হিসেবে ওকে আর দরকার নেই, অর্থাৎ মাসুদ রানা এখন একটা খরচযোগ্য আপদ। তিন, প্রতিশোধ। টোটার সেলে চীনা লোকটা হয়তো গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ ছিল, কিংবা টোটার খুব প্রিয় ছিল।

ওকে পথ থেকে সরাবার জন্যে কতটুকু মরিয়া ওরা, সেটা একটা প্রশ্ন। ব্যাংকক থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ওর ব্যবস্থা করার জন্যে দলের কাউকে রেখে যাবে পিছনে?

দূতাবাসে পৌঁছে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। সিঁড়ি মাত্রই অপছন্দ করে ও। হয় ঢোকার বা বেরুবার মুখে থাকে সিঁড়ি যার কাছেপিঠে একজন গানম্যান দাঁড় করানো যায়, যেখানে কোন কাভার থাকে না, এবং টার্গেট থাকে উঁচু জায়গায়।

সোহেলকে পাওয়া গেল না, তবে ওর জন্যে কয়েকটা চাবি রেখে গেছে

সে। আবার রাস্তায় নেমে এসে কালো রঙের একটা জাগুয়ার গাড়িতে চড়ল ও।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রানা বুঝল, টোটার লোকেরা তিন জায়গায় খুঁজবে ওকে। পুলিস-হাসপাতাল, বাংলাদেশ দূতাবাস আর হোটেল ইন্টারকন। প্রথম দু'জায়গায় ওরা নেই।

গাড়ি নিয়ে হোটেল ইন্টারকনে পৌঁছুল রানা। এবং ওখানেই এল তৃতীয় আক্রমণ।

বারো

জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। ঠাণ্ডা আলোয় ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের মুখ। কেউ একটু ঘুরে দাঁড়ালেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মুখটা। অন্ধকারে লোক দেখা যায় না, কিন্তু গলা শোনা যায়। সব মিলিয়ে কেমন সন্দেহজনক, ভৌতিক একটা পরিবেশ।

রিসেপশনের লোকজন সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করল। তাদের এই দুঃখ-প্রকাশ বিদ্যুৎ চলে গেছে বলে। মেইন সুইচ ফিউজ হয়ে গেছে, তবে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একটা বয় আলো আর পথ দেখিয়ে ওপরতলায় নিয়ে যেতে চাইল রানাকে।

কিন্তু একা উঠল রানা। হাতে একটা প্লেট, তাতে মোমবাতি। সিঁড়ির মাথায় একটা অ্যালকোভ, মোটা কম্বলটা পাওয়া গেল সেখানে। এই জিনিস কোত্থেকে জোগাড় করল সোহেল, সেটাই এক বিস্ময়। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, আট বাই আট ফুট। পুরু আধ ইঞ্চির কম নয়। প্রথমে ওটাকে চার ভাঁজ করল রানা, তারপর লম্বায় কমাবার জন্যে দু'ভাঁজ।

কম্বলটা সামনে ধরে রেখে নিজের কামরার দরজায় থামল রানা। একটু আগে হাতে মোমবাতি নিয়ে লোকজন ছিল করিডরে, এখন নেই। তালার চাবি ঘুরিয়ে একলাথি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল রানা।

পর পর পাঁচটা গুলি হলো। আওয়াজগুলো পাশের ঘরেও পৌঁছুল না, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। প্রতিটি গুলির সাথে পিছু হয়ে গেল রানা। ঢাল যতই কার্যকরী হোক, বুলেটের একটা ভয়ংকর ধাক্কা আছে। পেটের ভেতর যা কিছু আছে সব যেন উল্টেপাল্টে গেল।

মেঝেতে বসে পড়েছে রানা। জানালার ওদিকে দাঁড়ানো অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা সরে গেছে এক সেকেন্ড আগে। সাবধানের মার নেই, তাই আরও কয়েক সেকেন্ড ওখানেই বসে থাকল রানা, কম্বলটা ধরে আছে সামনে। দর দর করে ঘামছে ও। কম্বলের পোড়াটে উৎকট গন্ধ ঢুকছে নাকে। হাত থেকে পড়ে নিভে গেছে মোমবাতি, প্লেটটা মোজাইকের মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে।

সিধে হলো রানা। লোকটা সত্যি চলে গেছে কিনা জানার জন্যে আধ

ঘণ্টা ধরে কয়েকটা ঝুল-বারান্দা, আশপাশের কামরা, ফায়ারএস্কেপ, রাস্তা, সব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও।

নিচের বারে নেমে এসে খানিকটা গ্রীক মেটাক্সা ব্র্যান্ডি খেল রানা। নিজেকে অজুহাত দেখাল, ব্যথা কমবে। গ্লাসে প্রথম চুমুক দিয়ে আপনমনে হাসল ও। বলে কিনা মেইন সুইচ ফিউজ হয়ে গেছে। যে-হোটেলেই থাকুক ও, যদি শোনে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বিদ্যুৎ চলে গেছে, কথাটা কোনদিন আর বিশ্বাস করবে না।

ফোনে সব কথা সোহেলকে বলা সম্ভব নয়, শুধু বলল, 'আরেক পার্টি আমার খোঁজ করেছিল।' তারপর নিজের কামরায় ফিরে এসে আবার চারদিক চেক করল ও। সবশেষে একটা চাদর নিয়ে ঢুকে পড়ল বাথরুমে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ও। চারটে পেইনকিলার ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছে। ঘুম না আসার কোন কারণ নেই।

পরদিন ড্রেসিং বদলাবার জন্যে হাসপাতালে গিয়ে মুশকিলেই পড়ে গেল রানা। পুলিস ও ডাক্তার, দুটো দলই চোখে চোখে রাখতে চায় ওকে। ডাক্তাররা বলল, আপনি আমাদের রোগী, আপনার ভালমন্দ আমরা বুঝব, আপনার ওপর হুকুম জারি হলো, এই হাসপাতাল ছেড়ে অন্তত সাতদিন কোথাও যেতে পারবেন না।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, পুলিসের কাজকাম দেখে কথাটা মনে পড়ে গেল রানার। গুদাম ঘর আর আশপাশের এলাকায় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছে তারা। ওদের হাতে কোন সূত্র নেই, সেজন্যেই রানাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। ওদের ধারণা, অনেক তথ্যই গোপন করে যাচ্ছে ও।

সাইলেন্সার থাকলে গুলির স্পীড কমে যায়, তাই সবগুলো বুলেটই ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে ভাঁজ করা কম্বলটা। নার্স ওর গায়ে নতুন কোন ক্ষতচিহ্ন দেখলে রিপোর্ট করতে দেরি করত না, আর তাহলেই গটমট করে এসে হাজির হত কর্নেল রামনাথা, কথা আদায়ের জন্যে বক বক করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এবারও সোহেল এসে উদ্ধার করল ওকে। বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল ওরা। কঠিন সুরে জানতে চাইল সোহেল, 'এই ঝুঁকি আর ক'বার নিবি?'

'ওদের ঠিকানা না পাওয়া পর্যন্ত ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে, সোহেল,' শান্ত সুরে বলল রানা।

'মিশন থেকে তোকে সরিয়ে নেয়ার কথা ভাবছি আমি। ঢাকার সাথে যোগাযোগ...'

'ফর গডস সেক, সোহেল! এখন আমাকে বাদ দেয়ার উপায় নেই! এটাই আমাদের শেষ সুযোগ!'

থমথমে চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল। তারপর বলল, 'তোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপর, রানা। তোর কিছু হলে আমাকে

জবাবদিহি করতে হবে। ঝুঁকি নেওয়ারও একটা সীমা আছে। আর আমি মেনে নিতে পারি না। তাছাড়া, তোকে বাদ দিতে চাওয়ার আসল কারণ, তোর শরীরের অবস্থা ভাল নয়।'

কনুই দিয়ে সোহেলের পাঁজরে গুঁতো মারল রানা। 'রাস্তায় নাম, শালা! দেখি কে পারে!'

হেসে ফেলল সোহেল। তারপর বলল, 'না, ঠাট্টা নয়।'

'ঝুঁকির কথা তুলিস কেন বল তো?' রাজ্যের বিরক্তি দেখা গেল রানার চেহারায়। 'আমরা সবাই প্রতিটা সেকেণ্ডই ভয়ঙ্কর ঝুঁকির মধ্যে বাস করছি না?'

আরও অনেকক্ষণ তর্ক হলো। শেষ পর্যন্ত হাত জোড় করে ক্ষমা চাইল সোহেল, বলল, 'তোর সাথে কথায় আমি পারব না। কিন্তু তোর বন্ধু হিসেবে আমি তোকে অনুরোধ করছি, সীমার বাইরে ঝুঁকি নিতে পারবি না।'

'আচ্ছা, সোহেল, হঠাৎ আমি যদি মারা যাই, তুই খুব কাঁদবি, নারে?'

রানার জিজ্ঞেস করার মধ্যে এমন একটা কোমলতা ছিল, কথাটা বলার সময় ওর চোখে প্রাণপ্রিয় বন্ধুর প্রতি এমন একটা দরদ ফুটে উঠেছিল, শত চেষ্টা করেও চোখের পানি ঠেকিয়ে রাখতে পারল না সোহেল।

ধরা পড়ে গেলে লজ্জা পাবে সোহেল, তাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, ভান করল কিছুই দেখেনি। 'কাঁদবি না ছাই,' বলল ও। 'সবাইকে বলে বেড়াবি, শালা মরেছে না আমার জান জুড়িয়েছে! শালা আমার সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না!'

ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে সোহেল। 'শুধু তাই,' হাসল সে। 'লোককে আরও বলে বেড়াব, শালা আসলে মরেনি! নিশ্চয়ই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এসে ঘাড়ে হাত দিয়ে বলবে, এই বেকুব, কি হচ্ছে, তোকে না আমার সামনে সিগারেট খেতে নিষেধ করেছি!'

হেসে উঠল রানা। সোহেলের দিকে ফিরে বলল, 'এবার বিদায় হ দেখি। আমার কাজ আছে।'

রানার গাড়ি থেকে নেমে নিজের গাড়িতে উঠবে সোহেল। নামার সময় বলল, 'আমার কথা মনে থাকবে তো?'

'থাকবে, থাকবে!'

দূতাবাসে ফিরে গেল সোহেল। ইন্টারকনে ফিরে এল রানা।

হোটেলের পিছন দিকে গাড়ি রেখে সামনে চলে এল রানা। হোটেল এলাকা থেকে বেশি দূর গেল না, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করল চারপাশে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। প্রায় দূতাবাস পর্যন্ত হেঁটে এল, কিছুই ঘটল না। হোটেলের কাছে ফিরল আবার। কিছু না।

গ্রেনেড ঘটনার পর খুব তাড়াতাড়ি ওকে খুঁজে বের করেছিল টোটার লোকেরা। এখন ওদের দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। এর একটাই মানে হতে পারে, ব্যাংকক থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত রয়েছে ওরা, ওর জন্যে খরচ করার মত সময় নেই হাতে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার অর্ধেকটাই পেরিয়ে গেছে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। দুপুরের পর সিদ্ধান্ত নিল ও, আরও একটু ঝুঁকি নেবে। ব্যাংকক ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা, ওর ব্যবস্থা করার জন্যে একজনের বেশি লোক পাঠাতে পারবে বলে মনে হয় না।

গাড়ি নিয়ে দূতাবাসে চলে এল রানা। নিষিদ্ধ এলাকায়, দুটো ক্যাডিলাকের পাশে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল। দশ মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল। জানালা, ছাদের কিনারা, রাস্তা—চারদিকে সতর্ক চোখ বুলাল। কেউ নেই।

গাড়ি নিয়ে যানবাহনের ভিড়ে মিশে গেল ও। প্ল্যার্ন চিট থেকে বিদায়ু রোডে এল। ভিউ মিররে চোখ। গাড়ি চালাচ্ছে ধীরে-সুস্থে। সবুজ ট্রাফিক সিগন্যাল পেয়েও গাড়ি ছাড়ল মন্থর গতিতে, ওরা যাতে নিশানা স্থির করার সুযোগ পায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

রামা ফোরে ট্রাফিক জ্যাম। হাজার হাজার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। উইন্ডস্ক্রীনের ঠিক মাঝখানে সূর্য, চোখ কুঁচকে আছে রানা। একসময় ট্রাফিক জ্যাম ছুটতে শুরু করল। আশপাশের একটা প্রাইভেট কার তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সামনের একটা রিকশাকে ধাক্কা দিয়ে বসল। কাচ ভাঙার অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেল রানা। লাল ক্র্যাশ হেলমেট পরা একজন হোন্ডা আরোহী ওভারটেক করল ওর গাড়িকে।

হঠাৎ করেই দম বন্ধ হয়ে এল রানার। ব্যথা শুরু হলো ফুসফুসে। সেই মুহূর্তে পরিষ্কার বুঝল ও, কিভাবে কি ঘটেছে। সামনে তাকিয়ে লাল হেলমেট দেখতে পেল না। চোখের সামনে ঝাপসা লাগল সব। অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস। জানে, গাড়ির ভেতর বাতাস নেই, অক্সিজেন নেই, আছে শুধু রঙহীন সায়ানাইড গ্যাস। জার্মানরা ইহুদীদের মারার জন্যে এই গ্যাসই ব্যবহার করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারে।

চারদিক থেকে লোকজন হায় হায় করে উঠল। ফুটপাথের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল গাড়িটা। দু'চোখ দিয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে, এখন আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। অন্ধের মত হাতড়ে হাতলটা পেল ও। দরজা খুলল, কিন্তু সীট থেকে গড়িয়ে নেমে যাবার শক্তি পেল না। বুঝল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চলছে না। লোকজনের গলা ভেসে এল, 'হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ধরাধরি করে বের করো··· টেলিফোন···ডাক্তার···ভাগিস স্পীড ছিল না···'

খোলা দরজা দিয়ে ধরাধরি করে বের করা হলো ওকে। টের পেল রানা, কিন্তু চোখে কিছু দেখছে না এখনও। তাজা বাতাস পাওয়ায় ভাল লাগল শরীরটা। ফুসফুসের ছটফটে ভাবটা কমে আসছে ধীরে ধীরে। অনেক কষ্টে চোখ মেলল ও। সামনে সব ঝাপসা। তবু জোর করে তাকিয়ে থাকল ও। একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে এল দৃষ্টি। লোকজনের ভিড়টা ওকে ঘিরে রেখেছে দেখে নিরাপদ বোধ করল ও। এখন কেউ গুলি চালিয়ে সুবিধে করতে পারবে না।

'ধন্যবাদ···,' ফিসফিস করে বলল রানা। '···আমি এখন সুস্থ বোধ করছি।' উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও। 'প্লীজ, ভিড় করবেন না।' উঠে দাঁড়াল ও। এখনও হাঁপাচ্ছে, তবে দম আটকে আসছে না। 'যদি পারেন, ফুটপাথ থেকে ঠেলে নামিয়ে দিন গাড়িটাকে।'

দু'মিনিট পর আবার গাড়ি ছাড়ল রানা। হোন্ডাকে খুঁজে কোন লাভ নেই। জানালা দিয়ে গ্যাস বোমাটা গাড়ির ভেতর ফেলে দিয়েই দ্রুত পালিয়ে গেছে আরোহী। ওভারটেক করার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল লোকটা। তার চেহারা দেখতে পায়নি রানা। কিন্তু হোন্ডার নাম্বার প্লেট দেখেছে। ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট।

রুম সিঙ্গকে সতর্ক করে দিয়েছিল ও, ফলে প্রিন্সকে নিয়ে ব্যাংকক থেকে পালাতে পারেনি টৌটা। পালাতে না পেরে ব্যাংককের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে সে। থাইল্যান্ডে ছোট্ট এক টুকরো মাটি আছে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর, টৌটা আর তার সেল গিয়ে ঢুকেছে সেখানে। মার্কিন দূতাবাস!

সেখানে চলেছে রানা।

সুই রুম কিত-এর মাথায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ও। ফেট বুরি রোডে এসে একটা কাফেতে ঢুকল। টেলিফোন করবে।

টেলিফোনের কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা সেখান থেকে মার্কিন দূতাবাসের প্রবেশ পথটা দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কাফেটা দূতাবাসের একেবারে কাছেই, কিছু ঘটলে দেখতে পাবে ও।

এরপর কি ঘটবে, আন্দাজ করতে পারল না রানা। কিছুটা নির্ভর করে সোহেলের ওপর, কিছুটা নির্ভর করে সউদী দূতাবাসের ওপর, কিন্তু বেশিরভাগটাই নির্ভর করে থাই সরকারের ওপর। ওপর মহল থেকে কর্নেল রামনাপাকে কি নির্দেশ দেয়া হবে, মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করো? ব্যাপারটা অত সোজা না।

প্রথমবার লাইন পেল না রানা। ওর চোখ পড়ে রয়েছে রাস্তায়। দ্বিতীয়বার লাইন পাওয়া গেল। রুম সিঙ্গকে চাইল ও। একটু পর দীনার গলা পেল।

'সোহেল,' বলল রানা, 'আর্জেন্ট।'

'সউদী রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলছেন—ডেকে দেব?'

'এখুনি।'

'তুমি যে-কাজটা দিয়েছিলে···তোমার ওই লোককে মার্কিন দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারির সাথে আলাপ করতে দেখা গেছে একটা হোটেলে। আমাদের নজর আছে।'

অপেক্ষা করছে রানা। শরীরে ব্যথা আর ক্লান্তি। পিঠের দু'জায়গায় সেলাই কেটে গেছে। শোল্ডার-ব্লেডের সাথে জোড়া লেগে গেছে জ্যাকেট, ক্ষতগুলো থেকে বেরিয়ে এসে আঠার কাজ করেছে রক্ত। গলার ভেতর জ্বালা।

চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অথচ প্রথমে দেখতেই পায়নি রানা। হাতের রিসিভার ছেড়ে দিয়ে ছুটল ও।

ব্যাংকক ছেড়ে যাচ্ছে টোটা। পালাবার বুদ্ধিটা ভালই করেছে সে। কাফের সামনে দিয়ে একটা শুধু রোলস-রয়েস সিলভার শ্যাডো গাড়িকে ছুটে যেতে দেখেছে রানা। টোটা, তার দলের লোক বা প্রিন্স ফরহাদ, এদের কাউকে দেখেনি। গাড়িটার সামনে সউদী আরবের জাতীয় পতকা উড়ছে পতপত করে।

কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার হলো, সউদী রাষ্ট্রদূত ব্যবহার করেন ক্যাডিলাক, রোলস-রয়েস নয়। আর তিনি যখন গাড়িতে থাকেন, শুধু তখনই পতাকা ওড়ে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দূতাবাসে রয়েছেন তিনি, সোহেল কথা বলছে তার সাথে।

দৌড়ে গিয়ে উঠে বসল রানা জাগুয়ারে। এতটা রাস্তা দৌড়ে এসে হাঁপিয়ে গেছে ও। এতক্ষণে অনেক দূর চলে গেছে রোলস-রয়েস সিলভার শ্যাডো, কিন্তু সেজন্যে উদ্বিগ্ন হলো না ও। জানা আছে কোনদিকে যাচ্ছে ওরা।

সিলভার শ্যাডো আর রানার গাড়ির মাঝখানে দুটো গাড়ি রয়েছে। প্রায় একই স্পীডে ছুটছে চারটে গাড়ি, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। ভিউ মিররে সন্দেহ করার মত এখনও কিছু দেখেনি রানা। দুই কি তিনটে পুলিস পেট্রল ওদেরকে ওভারটেক করে গেল, প্রতিবার একটা করে স্যালুট পেল সিলভার শ্যাডো।

সিলভার শ্যাডোয় টোটা, প্রিন্স এরা কেউ আছে কিনা এখনও জানে না রানা। গাড়িটার পিছনের জানালা খুব নিচু, তার ওপর কাঁচটা গাঢ় রঙ করা, ভেতরের কিছু দেখার উপায় নেই।

শহর ছাড়িয়ে আসার পর রাস্তা প্রায় খালি হয়ে গেল। পুলিস পেট্রলও আর সহজে চোখে পড়ে না। সোনতানুবি রোড-ব্লক আর শহরের মাঝখানে রয়েছে ওরা।

খানিক পর পরিস্থিতি একটু বদলে গেল। সিলভার শ্যাডো আর রানার গাড়ির মাঝখানে এখন আর কোন গাড়ি নেই। মাঝে দূরত্ব তিনশো গজ।

ভিউ মিররে একটা টয়োটা দেখল রানা। ওর ঠিক পেছনেই অন্য এক জোড়া গাড়ি ছিল, সেগুলো সরে যেতে টয়োটাকে দেখতে পাচ্ছে ও। মনে হলো, স্পীড একটু বাড়িয়ে রানার আরও কাছাকাছি আসতে চাইছে ড্রাইভার।

সিলভার শ্যাডোর দিকে তাকাল রানা। চুই ই করে শব্দ হলো একটা। জানালার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ভিউ মিররে তাকিয়ে টয়োটাকে মাত্র পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে দেখতে পেল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে টোটা।

দ্বিতীয় গুলিটা গাড়ির গায়ে লেগে টিং আওয়াজ তুলল।

এইভাবে যদি গুলি হতে থাকে, একটা না একটা গায়ে এসে লাগবেই।

কাজেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়। গিয়ার বদলাল না রানা, ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেলে সাবধান হয়ে যাবে টোটা। স্পীড সামান্য কমাল, তারপর কোন রকম আভাস না দিয়ে আচমকা কষে ব্রেক করল ও। ভিউ মিররে দ্রুত বড় হয়ে উঠল টয়োটা। পরমুহূর্তে ধাক্কা খেল রানার গাড়ির পেছনে। এত জোরে, যে ফুয়েল ট্যাঙ্কের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করল রানা। মিররে আবার ছোট হয়ে এল টোটা। টয়োটাকে সিধে করে নিয়ে আবার পিছু লাগল সে।

এই একই কৌশলে দ্বিতীয় বার কাজ হবে না। রানা বুঝল, ফাঁদের মাঝখানে আটকা পড়েছে ও। তিনটে গাড়ি ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গতিতে ছুটছে। মাঝখান থেকে রানা যে বেরিয়ে যাবে, সে-উপায় নেই।

পরিস্থিতির ওপর সতর্ক নজর রাখছে সিলভার শ্যাডো। গাঢ় রঙের পিছনের জানালায় সাদাটে একটা মুখের আভাস পাওয়া গেল। ওরা গুলি করছে না, কারণ রানা অ্যাক্সিডেন্ট করলে টয়োটাও তার সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টো যেতে পারে। তাছাড়া, টোটাকে চেনে ওরা, তার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। জানে, তার হাত থেকে রানার রেহাই নেই।

হঠাৎ আতঙ্কিত বোধ করল রানা। মনে হলো, ওর ব্রেন ঠিকমত কাজ করছে না। বুঝল, এটা ঘটছে প্রচণ্ড ব্যথা আর ক্লান্তির জন্যে। নিজেকে অভয় দেবে, তারও সময় পাওয়া গেল না। ভিউ মিররে আগুনের একটা ঝলক দেখল রানা। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিছনের একটা টায়ার। গাড়িটাকে সিধে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বাতাস বেরিয়ে গিয়ে টায়ারটা যে শুধু চুপসে গেছে তাই নয়, রাস্তার সাথে ঘষা খেয়ে ছিঁড়েও গেছে। রাস্তার পাশে নুড়ি পাথর, তারপর ঢাল, তারপর ধানখেত। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে ছুটল গাড়ি। দরজা খুলে তৈরি হতে যাবে রানা, তার আগেই লাফ দিয়ে ঢালের গায়ে পড়ল জাগুয়ার। তারপর ডিগবাজি খেতে শুরু করল।

জ্ঞান ফেরার পর রানা দেখল কাদার ওপর পড়ে আছে ও। ওর গাড়ি কোথায় উল্টে পড়ে রয়েছে কে জানে। ওপরের রাস্তা থেকে ব্রেক করার আওয়াজ ভেসে এল, দুটো গাড়ির। বুঝল, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল ও।

শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ মেলে পড়ে থাকল রানা। হাল ছেড়ে দিতে চাইছে শরীরটা। উঠে বসার কোন চেষ্টাই করল না, জানে পারবে না। চোখ মেলে থাকলেও, চার-পাঁচ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না ও। ওর সামনে রয়েছে সবুজ পর্দার মত ধান গাছ।

ভয়ে ভয়ে একটা হাত একটু নাড়ল রানা। নাড়তে পারল দেখে আত্মবিশ্বাস বাড়ল। হাতটা ব্যথা করছিল বলে মনে হয়েছিল, ভেঙে গেছে ওটা। হাত দিয়ে সামনের গাছগুলোকে সরাবার চেষ্টা করল ও।

সবুজ পর্দা একপাশে একটু সরে যেতেই ঢালটা দেখতে পেল রানা। ঢালের মাথায় রাস্তা, কিনারায় কয়েকজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও।

জানে, ওদের মধ্যে টোটাও আছে।

একজন লোক ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। লোকটা কে, কেন আসছে কিছুই বুঝতে বাকি থাকল না রানার।

ঢাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসেছে টোটা, এই সময় শেষ বিকেলের আকাশ হঠাৎ সবুজ হয়ে উঠতে দেখল রানা! দৃষ্টিভ্রম? জ্ঞান আছে কিনা পরীক্ষা করল ও। ঠোঁট কামড়াল। ব্যথা লাগে। হাত আর পা যেদিক খুশি নাড়তে পারল। সব ঠিক আছে। কিন্তু একদিকের আকাশে সবুজ রঙটা থেকেই গেল।

তারপর টোটার গলা পেল রানা। ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ধানখেতের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে আছে ওপরে, নিজের লোকজনের দিকে। চীনা ভাষায় কি যেন বলল সে। মাত্র একটা শব্দ ধরতে পারল রানা—নোনতাবুরি। লোকগুলোকে কি যেন নির্দেশ দিল সে।

রাস্তার কিনারা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। একটু পরই স্টার্ট নিল রোলস-রয়েস।

গাড়িটা আবার রওনা হয়ে যেতে রাস্তার দিকে পিছন ফিরল টোটা। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ধানখেতে।

আয় ব্যাটা! কাছে আয়! তোর জন্যেই অপেক্ষা করে আছি!—রানা আবিষ্কার করল, বিড়বিড় করছে সে। এত বিপদের মধ্যেও হাসি পেল ওর। মনে মনে জানে, ওকে গুলি করার জন্যে নেমে আসছে টোটা। নিচে নেমে প্রথমে দেখবে, ও মরে গেছে কিনা। যদি মনে হয় ও মরে গেছে, তবু গুলি করবে। যদি দেখে বেঁচে আছে, তাহলে তো করবেই।

এই পরিস্থিতিতে গুলি করতে হলে, রানার একেবারে কাছে আসতে হবে তাকে।

বুকের ভেতর দড়াম দড়াম আওয়াজ করছে রানার হৃৎপিণ্ড। কাছে চলে এসেছে টোটা। কিন্তু রানার বুকের আওয়াজ শুনতে পাবে না সে। মড়ার মত পড়ে থাকল রানা। চোখ দুটো খোলা, কিন্তু তারা দুটো স্থির, পাতা জোড়া কাঁপছে না।

'রানা?'

কোন সাড়া না পেয়ে আরও খানিক এগিয়ে কাদায় পা দিল টোটা। 'রানা, শুনতে পাচ্ছ?' ইংরেজীতে কথা বলল সে। গলায় কর্তৃত্বের সুর।

নিঃসাড় পড়ে থাকল রানা। শ্বাস নিচ্ছে না, ফেলছেও না।

আরও একটু এগিয়ে এসে রানার ওপর ঝুঁকে পড়ল টোটা। রানার সামনে ঢাকা পড়ে গেল আকাশ।

'শুনতে পাচ্ছ না?' ঘৃণার সুরে বলল সে। 'তুমি যাকে খুন করেছ সে ছিল আমার ছোট ভাই। আমি চাই, কথাটা তুমি জানো। ও আমার ভাই ছিল।'

ব্রেক করার আওয়াজ। ঝট করে সিধে হলো টোটা। মুখ তুলে ঢালের কিনারায় তাকাল। খুব যে দ্রুত হাত বাড়াল রানা, তা নয়। তবে টোটার পা ধরে টানটা দিল প্রচণ্ড জোরে।

কাদার মধ্যে ধপাস করে বসে পড়ল টোটা। হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল। পড়বি তো পড়, একেবারে রানার পেতে দেয়া হাতে।

একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা, তারপর লাফ দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই অবাক করে দিল ও।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে টোটা। বিস্ময়ের ধাক্কায় বোবা বনে গেছে, ঘটনাটা এখনও সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

টোটাকে সামনে নিয়ে ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠল কর্দমাক্ত রানা। টোটার হাত দুটো থাকল তার মাথার পিছনে, দশটা আঙুল পরস্পরের সাথে আটকানো। ডান হাত পিছনে থাকল রানা, রিভলভারটা সারাক্ষণ টোটার শিরদাঁড়ার ওপর তাক করে রেখেছে।

দিনের আলো যাই যাই করেও পুরোপুরি যায়নি এখনও। টয়োটার পাশে একটা বড় মার্কিন গাড়ি দেখল রানা। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে মূর্তি। তাদের মধ্যে একজন উত্তম আবদুল্লা।

'মি. রানা,' বলল সে, 'ওখানে কি ঘটছিল ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তা নইলে আপনাকে সাহায্য করতে যেতাম।'

আবদুল্লার লোক দুটোর দিকে একবার তাকাল রানা, কিন্তু তাদের পরিচয় জানতে চাইল না। আবদুল্লা তাদেরকে নির্দেশ দিল, 'আমাদের চাইনিজ বন্ধুর ওপর একটু নজর রাখো তোমরা। খুবই চঞ্চল প্রকৃতির লোক উনি।'

ফেলে আসা রাস্তার দিকে একবার তাকাল রানা। রাস্তাটা ধনুকের মত বেঁকে গেছে। বাঁকের কাছে একটা কালো রঙের গাড়ির নাক মত কি যেন দেখা গেল। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা, তাকাল আবদুল্লার দিকে। বলল, 'নোনতাবুরি যাব আমি। ওরা যাতে রোড-ব্লক পেরিয়ে ওপারে না যেতে পারে...'

হাসির শব্দে টোটার দিকে ফিরল রানা।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, রানা,' টোটার চেহারায় তৃপ্তির একটা ভাব ফুটে উঠল। 'তুমি আমাকে হয়তো হাতে পেয়েছ, কিন্তু আমার মিশনটা ব্যর্থ করতে পারোনি।'

'টয়োটায় তোলো ওকে,' আবদুল্লার গার্ড দু'জনকে নির্দেশ দিল রানা। এগোল টয়োটার দিকে। দু'পাও এগোয়নি, উত্তর দিক থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। রাইফেল, মেশিনগান। মাইল কয়েক দূরে হবে, যেখানে রোড-ব্লকটা থাকার কথা।

আবার ভারী গলায় হাসি শোনা গেল। টোটা বলল, 'বললাম না।'

উত্তর দিকের অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আগুনের ঝলক দেখা গেল কয়েকবার। গ্রেনেড। টোটার দিকে দু'পা এগিয়ে এল রানা। 'কি হচ্ছে ওদিকে?'

'মড়ার ভান করে পড়ে ছিলে,' বলল টোটা, 'আকাশে সবুজ আলো দেখোনি? মিনিট সাতেক আগে? প্যারাস্যুট-ফ্লেয়ার?'

দেখেছি।'

'ওটা ছিল একটা সিগন্যাল,' সহাস্যে বলল টোটা। 'অর্থ, নোনতাবুরি রোড-ব্লকের ওপর হামলা শুরু হতে যাচ্ছে। সীমান্ত টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ঘাটজন, রোড-ব্লকটা গুঁড়িয়ে দিয়েই আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাবে ওরা। কোন ঘটনা ছাড়াই রোড-ব্লক পেরিয়ে যাবে রোলস-রয়েস। আরও তিন মাইল সামনে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে হেলিকপ্টার…'

কেন যেন, অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখাল উত্তম আবদুল্লাকে। রানার প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে, 'হ্যাঁ, মি. রানা, চাইনিজ বন্ধু যা বলছে সবই সত্যি। আমার পাওয়া ইনফরমেশনের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে সব।'

'তোমার প্রশংসা করি এই জন্যে যে,' ব্যঙ্গ করে বলল টোটা, 'চেষ্টায় কোন ত্রুটি করোনি তুমি, রানা। কিন্তু মার খেয়ে গেছ আমার বুদ্ধির কাছে। এখন আর কিছুই করার নেই তোমার। বিনিময় ঘটবেই।'

উত্তম আবদুল্লা চট করে একবার টোটার দিকে তাকাল চোরা চোখে। সরাসরি না তাকিয়েও ব্যাপারটা লক্ষ করল রানা। 'একটা গাড়ি আসছে,' বলল ও।

ঝট করে রাস্তার দিকে তাকাল আবদুল্লা। কালো মরিস এসে থামল ওদের পাশে। একে একে বেরিয়ে এল ঢাউস বেলুন, তালপাতার সেপাই আর ঙয়োপোকা। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত রিভলভার।

টোটা ও আবদুল্লার কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল রানা। 'আগে ওদের হাতুড়ি কেড়ে নাও,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

রক্তশূন্য হয়ে গেছে আবদুল্লা আর তার বডিগার্ডদের চেহারা। 'এসব কি?' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল আবদুল্লা। 'আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিও সবটুকু বুঝিনি এখনও,' বলল রানা। 'আশা করছি সব কথা বলে তুমি আমাকে বাকিটুকু বুঝতে সাহায্য করবে।'

'আমি? আমি কি বলব! আমার কি বলার থাকতে পারে!' যেন এইমাত্র আকাশ থেকে পড়ল আবদুল্লা।

ওরা কথা বলছে। কিন্তু দীনা আর তার দলের কাজ থেমে নেই। গার্ড দু'জনের রিভলভার কেড়ে নিয়ে ওদেরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে ওরা। আবদুল্লাকে সার্চ করে একটা পিস্তল পাওয়া গেল।

'গাড়িতে ওঠো।' নির্দেশ দিল রানা।

আবদুল্লার গাড়িতে উঠল ওরা চারজন—সামনের সীটে টোটা আর আবদুল্লা, পিছনে রিভলভার হাতে রানা আর দীনা। গার্ডদের নিয়ে মাহবুব আর মিলন উঠল মরিসে। টোটার টয়োটা রয়ে গেল ওখানেই।

গাড়ি চালাচ্ছে আবদুল্লা।

'টোটা,' জানতে চাইল রানা। 'তুমি আমার সবকিছু আগেভাগেই জানতে পারো। কিভাবে জেনেছিলে?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে কি যেন ভাবছিল টোটা, উত্তর দিল কয়েক সেকেন্ড

পর। 'রোজউড বুদ্ধ-মূর্তির ভেতর একটা মাইক্রোফোন ছিল।'

রানার ক্লান্ত, রক্তাক্ত চেহারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল দীনা। তারপর কাপড়ে কাদা লাগার কথা ভাবল না, এক হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি অসুস্থ, রানা। পরে কথা বোলো।'

জোর করে একটু হাসল রানা। 'আমি ঠিক আছি,' দীনাকে বলল ও। তারপর আবার প্রশ্ন করল টোটাকে, 'বিনিময়ের ঘটনা…' কথা বলতে গেলে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে রানার। '… কোথায় ঘটবে?'

'মি. রানা,' মাঝখান থেকে বলল আবদুল্লা। 'সেই প্রথম থেকে আমি আপনাদের উপকার করে আসছি। এই কি তার প্রতিদান? আমি কি করেছি সেটা পর্যন্ত বলছেন না…'

'চুপচাপ গাড়ি চালাও,' কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'সময় হলে সব বলা হবে। টোটা?'

'অনুষ্ঠানটা হবে লাওস সীমান্তের কাছে,' বলল টোটা। 'মেকং নদীর ওপর কেমেরাজ ব্রিজে। কেমেরাজ এখান থেকে প্লেনে তিন ঘণ্টার পথ। রোলস-রয়েসের প্যাসেঞ্জাররা আজ রাত দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে ওখানে। প্রিন্সের নিরাপত্তার জন্যে সশস্ত্র গার্ড আছে। বিনিময় হবে কাল সকালে।'

রিভলভার ধরা হাতটা উঁচু করল রানা। তারপর সজোরে নামাল টোটার মাথার ওপর। কোন শব্দ করল না টোটা, শরীরটা শুধু বার কয়েক ঝাঁকি খেল। কাত হয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু আটকে গেল গাড়ির দরজায়।

'এবার তোমার সাথে কথা বলি, আবদুল্লা,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'আমি একটা মিশন নিয়ে কাজ করছি। টোটাও একটা মিশন নিয়ে কাজ করছিল। আমার বিশ্বাস, তোমারও একটা নিজস্ব মিশন আছে। কি সেটা?'

'আমার মিশন?' দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল আবদুল্লা। 'আপনি ভুল ইনফরমেশন পেয়েছেন, মি. রানা। আমার কোন মিশন নেই।'

'মার্কিন দূতাবাসের ইহুদি থার্ড সেক্রেটারির সাথে তোমার এত খাতির কিসের?' জানতে চাইল রানা।

সাথে সাথে কোন জবাব দিল না আবদুল্লা। তারপর মুখ খুলল, 'কার সাথে আমার খাতির না খাতির, আপনাকে বলতে হবে কেন? টোটাকে ধরার জন্যে আপনাকে আমি সাহায্য করেছি…'

'তা করেছ,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু সেই সাথে ওই থার্ড সেক্রেটারির সাথেও তোমার একটা চুক্তি হয়েছিল, তাই না?'

'কি বলছেন আপনি!'

'চুক্তিটা কি এই রকম নয়?—টোটা যদি প্রিন্স ফরহানকে কেমেরাজ ব্রিজে সময়মত হাজির করতে না পারে, ওদের হাতে আমাকে তুলে দেবে তুমি। কত টাকার চুক্তি ওটা, আবদুল্লা?'

'এসব কথা কে বলল আপনাকে?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল আবদুল্লা।

'তার মানে স্বীকার করছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল আবদুল্লা। চুপচাপ গাড়ি চালাল কিছুক্ষণ। 'সবই যখন

জানেন, আমার স্বীকার করা না করায় কি এসে যায়?'

আসলে সবটাই রানার অনুমান। 'কত টাকা, আবদুল্লা?'

'টোটা প্রিন্সের জন্যে পাচ্ছিল একশো ষাট মিলিয়ন হংকং ডলার, আমি আপনার জন্যে ওদের কাছ থেকে তার অর্ধেক দাবি করি। ওদের অবশ্য বিশ্বাস ছিল, টোটা সময়মতই প্রিন্সকে কেমেরাজ ব্রিজে হাজির করতে পারবে। ওদের বিশ্বাসটাই সত্য হয়েছে।'

সাথে করে সেজন্যেই বডিগার্ড নিয়ে এসেছে আবদুল্লা। আজ রানা যদি টোটার হাত থেকে প্রিন্সকে উদ্ধার করতে পারত, পরমুহূর্তে সরাসরি আবদুল্লার ফাঁদে পা দিতে হত ওকে।

'তোমাকে কখন পেমেন্ট করত ওরা?'

'একহাতে আপনাকে নেবে, আরেক হাতে আমাকে টাকা দেবে।'

শরীরের সমস্ত ব্যথা ভুলে হঠাৎ হেসে উঠল রানা। 'নিজের সম্পর্কে অন্তত একটা কথা সত্যি বলেছিলে তুমি, আবদুল্লা। সত্যি তুমি মানুষ হতে পারোনি। দু'মুখো সাপেরা কখনোই তা হতে পারে না।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলল দীনা। কড়া আইন জারি করল সে, 'আর একটি কথাও নয়, রানা।'

নড়েচড়ে উঠল টোটা।

বাংলাদেশ দূতাবাসে গাড়ি থেকে নামল ওরা। আলোয় ঝলমল করছে ভবনটা। সামনে সাংবাদিকরা ভিড় করে আছে। পুলিসের গাড়িও দেখল রানা।

ধরতে হলো না, নিজের চেষ্টাতেই গাড়ি থেকে নামতে পারল টোটা। তার মাথার পিছনটা বেঢপ ভাবে ফুলে আছে, শার্টের পিছনে সামান্য একটু রক্তের দাগ। তাছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থই দেখাল তাকে।

আবদুল্লাকে পুলিসের হাতে তুলে দিল রানা। দু'জন অফিসার ছিল ওখানে, তাদেরকে বলল, 'কর্নেল রামসাপাকে সবকথা জানাব আমি। তার আগে পর্যন্ত ওকে শুধু আটকে রাখার ব্যবস্থা করুন।'

ওদের কাছ থেকেই জানল রানা, আবদুল্লার বডিগার্ড দু'জনকে এরই মধ্যে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোন অভিযোগ আনা হয়নি।

পুলিস কর্ডন পেরিয়ে সাংবাদিকরা ওদের কাছে আসতে পারল না বটে, কিন্তু ফটোগ্রাফাররা একের পর এক ছবি তুলতে থাকল। ফ্ল্যাশ-গানের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার।

টোটাকে সামনে নিয়ে রুম সিক্সে উঠে এল রানা। ঘরটা খালি, কেউ নেই। ভাল মানুষ চেহারার একজন কেরানীকে ডেকে রানা বলল, 'মি. সোহেলকে দরকার আমার।'

আসতে বেশ সময় নিল সোহেল। গোটা দূতাবাসে উত্তেজনা আর থমথমে ভাব। কিন্তু সোহেলকে সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল, টোটাকে দেখেও কোন

রকম উচ্ছ্বাস বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না।

'দোস্ত, চিনতে পারছিস? আমি মাসুদ রানা। আর আমার সাথে এই লোকটার নাম টোটা, দি মঙ্গোলিয়ান।'

ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোহেল, রানার রসিকতায় সাড়া দিল না।

হঠাৎ করেই মাথাটা একবার ঘুরে উঠল রানার। দরজার গায়ে হেলান দিল ও। দীনা আসছে না কেন? বলল, তোমার জন্যে একটু ব্রান্ডি পাই কিনা দেখি। গেল কোথায়?

একটা চেয়ারে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে টোটা।

টেলিফোনের রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করল সোহেল। দু'একটা কথা বলে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

'নোনতাবুরির খবর কি?'

'রোড-ব্লক উড়িয়ে দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'যতদূর জানি, এই মুহূর্তে একটা প্লেনে রয়েছে প্রিন্স। বিনিময় কেমেরাজ ব্রিজে হবে। লাওস সীমান্ত।'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। বোঝা গেল, ওর তথ্যের সাথে রানার তথ্য মিলে গেছে।

'এখানের খবর কি, সোহেল? কিছু একটা ঘটেছে।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহেল। 'সউদী আরব ইসরায়েলিদের সাথে কোন রকম লেনদেন বা বিনিময়ে অংশ নিতে রাজি নয়। সউদী দূতাবাস বাংলাদেশের দূতাবাসকে অনুরোধ করেছে, আমরা যেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করি। রাজি হয়েছি আমরা। ন্যাট চাগালও পৌঁছে গেছে।'

'এখানে? এই বিল্ডিঙে?'

'হ্যাঁ। আমাদের রাষ্ট্রদূত তাকে নিয়ে এক্সচেঞ্জ পয়েন্টে রওনা হবেন। তোর জানার মধ্যে ভুল নেই, কেমেরাজ ব্রিজেই অনুষ্ঠান হবে। আমাদের রাষ্ট্রদূত এই মুহূর্তে মার্কিন দূতাবাসের সাথে কথা বলে সব ঠিকঠাক করছেন।' কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল সোহেল। ডান হাতের আঙুল চালাল চুলে।

সোহেলকে এই রকম হতাশ হতে আগে কখনও দেখেনি রানা। মিশন ব্যর্থ হওয়ায় রানাকে নয়, নিজেকে দায়ী করেছে সে। এই পরাজয় মেনে নিতে পারছে না।

'সোহেল, টোটাকে পুলিস যেন নিয়ে যেতে না পারে।'

ঝট্‌ করে ফিরল সোহেল। 'ওকে আর আমাদের দরকার নেই। ওর যদি কিছু করার থাকত, এতক্ষণে নিজেই মুখ খুলত।'

টোটা জানে, তার মিশন সফল হলেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি সে। মিশনটা এখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। প্রাণের মায়া বড় মায়া, যদি কাজ হবে বলে মনে করত সে, একটা টেলিফোন করে নিজের লোকদের নির্দেশ দিত প্রিন্সকে যেন সীমান্তের এপারেই রাখা হয়। তার লোক এখন আর তার নির্দেশ মানবে না, কারণ প্রিন্সকে একদল লোকের হাতে তুলে দেয়ার সাথে সাথে একশো ষাট মিলিয়ন হংকং ডলার পাবে তারা। টোটার জন্যে

নিজেদেরকে তারা বঞ্চিত করতে চাইবে না।

'তবু আমি চাই,' বলল রানা, 'ওকে এই ঘরেই রাখা হোক।' একটু সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। 'আমাকে দেখে যতটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে, অতটা ক্লান্ত আসলে নই আমি। যা বলছি বুঝেশুনেই বলছি।'

তর্ক করতে যাচ্ছিল সোহেল, কিন্তু কি মনে করে চুপ করে থাকল।

একটা গ্লাসে করে খানিকটা ব্র্যান্ডি নিয়ে এল দীনা।

গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল রানা। 'দীনা, পুলিস অফিসার কাউকে পেলে ডেকে নিয়ে এসো এখানে।'

চলে গেল দীনা। একটু পরই একজন অফিসারকে নিয়ে ফিরে এল সে।

'টোটা রয়েছে এখানে,' অফিসারকে বলল রানা, 'কোন অসুবিধে হতে পারে বলে মনে করছেন আপনারা?'

'অবশ্যই,' বলল অফিসার। 'ওকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছিলাম আমরা। কর্নেল রামসাপা এইমাত্র টেলিফোন করেছিলেন। বললেন, হয় ওকে আপনারা আমাদের হাতে তুলে দিন, তা না হলে, এখনও যদি মনে করেন ওর সাহায্যে প্রিন্স ফরহাদকে ফিরে পাবার সম্ভবনা আছে, আপনাদের দূতাবাস ফোর্স দিয়ে ঘেরাও করে রাখার অনুমতি দিন।'

'অনুমতি দেয়া হলো,' বলল রানা। বলেই সোহেলের দিকে তাকাল ও।

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল সোহেলের ঠোঁটে। 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে ভালই শিখেছিস। তুই অনুমতি দেবার কে?'

'বাংলায় বললি বলে ছেড়ে দিলাম, তা না হলে এই অপমানের জন্যে আমি তোর···'

হাত নেড়ে অফিসারকে বিদায় জানাল সোহেল, 'ঠিক আছে, আপনি সে ব্যবস্থাই করুন।' রানার দিকে ফিরে বলল, 'ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।' ফোনের রিসিভার তুলল সে।

অফিসারের সাথে দীনাও চলে গেল, কিন্তু একটু পরই ফিরে এল সে। পিছনে দূতাবাসের আবাসিক ডাক্তারকে নিয়ে।

'আমাকে নিয়ে যা খুশি করুন,' ডাক্তারকে বলল রানা। 'কিন্তু অজ্ঞান করতে পারবেন না বা ঘুমের ওষুধ দিতে পারবেন না। রাজি?' দরজার কাছ থেকে ঘরের ভেতর ঢুকল ও। ঘুরে উঠল মাথা।

ছুটে এসে ওকে ধরে ফেলল দীনা। সোহেলও এগিয়ে এল। হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে দীনাকে সরিয়ে দিল রানা, চিৎকার করে বলল, 'সোহেল, সরে যা।'

চিৎকারটা শুনেই ডাইভ দিল সোহেল। দেখল রানার হাতের রিভলভার টোটার দিকে তাক করা। টোটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, ভঙ্গি দেখে মনে হলো লাফ দিতে যাচ্ছিল সে।

সুযোগটা কাজে লাগল না দেখে পিছিয়ে গিয়ে আবার নিজের চেয়ারে বসল টোটা। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। রানাই সেটা ভাঙল।

'আমার হাত থেকে রিভলভারটা নে, সোহেল। আমার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত ওকে পাহারা দিবি।'

আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে সোহেল, এগিয়ে এসে রানার হাত থেকে রিভলভারটা নিল। 'ঠিক আছে, ঘুমিয়ে নে গে যা।'

রানাকে ধরে আছে দীনা। 'চলো।'

সোহেলকে পরিষ্কার দেখতে পেল না রানা। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। 'কখন, সোহেল? সময়টা বল আমাকে।'

'রাত দুটোয়···'

'চাগানকে এখান থেকে রাত দুটোয় নিয়ে যাওয়া হবে?'

'হ্যাঁ।'

রানা অনুভব করল, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও, আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে হাঁটু দুটো। 'শোন সোহেল,' ফিসফিস করে বলল ও। 'বেশিক্ষণ ঘুমাতে দিবি না আমাকে। লক্ষ রাখবি—ঘুমের ইঞ্জেকশন যেন না দেয়। রাত বারোটায় জাগিয়ে দিবি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস?'

'বারোটায় জাগিয়ে দেব···'

'হ্যাঁ। গুদাম ঘরে আছে ওটা, আনিয়ে রাখবি, কেমন? রাইফেলটার কথা বলছি। হাতভাঙা। দরকার। ভুলবি না। কথা দে, সোহেল।'

'কথা দিলাম। এবার তুই যা। দীনা···'

তেরো

ঠিক রাত দুটোয় টোটাকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ঘুম থেকে জাগার পর একা সোহেলকে নিজের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করেছে রানা। প্ল্যানটা পছন্দ করেনি সোহেল। আপত্তির কারণ, এতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু রানার যুক্তিটাও অগ্রাহ্য করতে পারেনি সে, কারণ এটাই ওদের শেষ সুযোগ।

টোটাকে এখনও কিছু বলেনি রানা। বলবে একেবারে শেষ মুহূর্তে। যাতে প্রস্তাবটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার সময় না পায়।

রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে জায়গা নেই আর। ফার্স্ট সেক্রেটারি, থার্ড সেক্রেটারি, সোহেল, দীনা, টোটা ও রানা—মোট ছয়জন ওরা। পিছনেই রয়েছে একটা পুলিস কার, নাটি চাগানের সাথে ওতে রয়েছে মাহবুব আর মিলন। চাগানকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছে রানা। অল্প বয়স, চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। বিনিময় সম্পর্কে তাকে কেউই কিছু বলেনি, কিন্তু ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো, আন্দাজ করতে পেরেছে সে।

রানার ঘুম ভাঙার খানিক পর সোহেল জানিয়েছে, 'ফোন করে আমাদেরকে জানানো হয়েছে, নব্বই মিনিট আগে এক্সচেঞ্জ পয়েন্টে পৌঁচেছেন

প্রিন্স ফরহাদ।'

'যাক, একটা ভাল খবর পাওয়া গেল।'

'মানে?'

'ফরহাদ বেঁচে আছে, তাই না? নোনতাবুরি রোড-ব্লকের ঘটনাটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ওখানে হাঙ্গামা তো আর কম হয়নি, রোলস-রয়েস তার মধ্যে পড়েনি সেটাই ভাগ্য।'

এয়ারপোর্টে যাবার পথে বার বার রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল টোটা। কিন্তু তার চেহারায় কোন ভাব ফুটল না।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে থাই এয়ারফোর্সের একটা বিমানে চড়ল ওরা। রাত তিনটের সময় আকাশে উঠল বিমান। গন্তব্য লাওস সীমান্ত।

ছোট একটা আর্মি কনভয়ে চড়ে কেমেরাজ ব্রিজে পৌঁছুল ওরা। ষাট জন থাই সৈনিক রয়েছে এখানে। জানা গেছে, ব্রিজের ওপারে ওরা কেউ ইসরায়েলি নয়, সবাই মাফিয়ার লোক। বোঝা যায়, মাফিয়ার সাথে ইসরায়েলের একটা চুক্তি হয়েছে। ইসরায়েলের হয়ে সমস্ত ঝামেলা, দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে মাফিয়া।

থাই সৈনিকদের কমান্ডার রিপোর্ট করল বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির কাছে। সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। তাঁকে জানানো হলো, দরকার হলে এবং তিনি অর্ডার করলে গুলি চালাবার হুকুমও ওপর মহল থেকে দেয়া হয়েছে।

থাই কূটনীতিকদের কেউ উপস্থিত হননি। ইসরায়েলের অনেকগুলো শর্তের একটি ছিল এটা, থাই সরকার যেন এই ব্যাপারের সাথে নিজেকে না জড়ায়।

গোটা অবস্থাটা বুঝে দেখা দরকার, তাই গাড়ির কাছ থেকে খানিকটা সরে এল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই, থমথম করছে পরিবেশ। ব্রিজের এদিকে ষাটজন সৈনিক, ওদিকেও নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু কোন পক্ষই কোন আওয়াজ করছে না। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ রানার কানে ঢুকল। একজন লোক খুক করে কাশল। দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল একটা লাইটার। ধাতুর সাথে কি যেন একটা ঘষা খেল। যুদ্ধক্ষেত্রের থমথমে নিস্তব্ধতা, আক্রমণ শুরু হবে যেন একটু পর।

হাতঘড়িতে ছ'টা বাজে। আকাশের গায়ে নতুন দিনের আলো। ব্রিজের শেষ প্রান্ত থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর শোনা গেল কর্কশ কণ্ঠের একটা কমান্ড।

মিলিটারি কনভয়ের কাছে ফিরে এল রানা। ক্যামোফ্লেজড কেবিনে ঢুকল ও। কয়েক জন সৈনিক টোটাকে পাহারা দিচ্ছে এখানে। ভোরের আলোয় ম্লান দেখাচ্ছে তার চেহারা। মুখ তুলে খুব সতর্কতার সাথে দেখল রানাকে। গাড়ি থেকে সৈনিকদের নেমে যেতে বলল রানা। কি ঘটতে যাচ্ছে তা খুব কম লোকই জানে—সোহেল, দু'জন সেক্রেটারি আর দীনা। পরিস্থিতি এমনিতেই

অত্যন্ত নাজুক। সৈনিকদের তাই সব কথা জানানো হবে না। উত্তেজনার মুহূর্তে কেউ যদি একটা গুলি করে বসে, সাথে সাথে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

রানা প্রিন্স ফরহাদকে নিরাপদে ব্রিজের একদিকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। কিন্তু বিনিময়ে চাগালকে দিতে রাজি নয় ও। চাগালের উপযুক্ত জায়গা ক্লিয়াদ সেন্ট্রাল জেল, সেখানেই ওকে ফেরত পাঠাতে চায়।

'টোটা,' মৃদু গলায় বলল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর খুব ভেবেচিন্তে দেবে তুমি। একটা প্রস্তাব আছে আমার। প্রস্তাবটা দেয়ার আগে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, তোমার প্রাণে বাঁচার একটা ব্যবস্থা তুমি চাইলে হতে পারে।'

ঢোক গিলল টোটা। যত বড় খুনিই হোক, নিজের মৃত্যুকে কে না ভয় পায়।

'প্রিন্সকে কিডন্যাপ করার প্রস্তাবটা তুমি কি ইসরায়েলের কাছ থেকে সরাসরি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' কোন রকম দ্বিধা নেই উত্তরে। টোটা এখন রানার হাতের পুতুল।

'ব্রিজের ওপারে যারা রয়েছে, মাফিয়ার লোকজন, যারা প্রিন্সকে ছেড়ে দিয়ে চাগালকে নেবে—ওদের ওপর তোমার কর্তৃত্ব কতটুকু খাটবে? ওদেরকে অর্ডার করার বিশেষ কোন ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়েছে? মৌখিক নয়, লিখিত কিছু?'

'লিখিত কিছু দেয়া হয়নি,' বলল টোটা। 'তবে ওদের সাথে আমার কথা হয়েছে, ওদের হাতে আমি প্রিন্সকে তুলে দিতে পারলে তবেই ওরা আমাকে টাকা দেবে। আমি ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।'

'কিন্তু আমি জানতে চাইছি...'

'কথা তো ছিল মাফিয়ার ওরা আমার অধীনে কাজ করবে,' বলল টোটা। 'কিন্তু ওরা ওদের কথা রাখবে বলে মনে হয় না। আমি যদি ওদেরকে এখন চিঠি পাঠিয়ে জানাই যে প্রিন্স ফরহাদকে ফেরত দেয়া হোক, আমি টাকা চাই না—ওরা হেসেই খুন হবে। এ ধরনের চুক্তি এই রকমই হয়, যে আগে সুযোগ পায় সেই ভাঙে।'

'ওরা হেসে খুন হোক আর কেঁদে মরুক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমাকে ঠিক ওই কাজটিই করতে হবে। ওদের কাছে যাবে তুমি। গিয়ে বলবে, প্রিন্সকে তুমি দেবে না, টাকাও নেবে না।'

'এই পাগলামির কোন মানে হয় না...'

প্রতিবাদ করলেও টোটার চোখে বাঁচার আকুতি ফুটে উঠতে দেখল রানা। খুশি হলো ও। বলল, 'ওদেরকে কিভাবে তুমি রাজি করাবে সে তোমার ব্যাপার। ওরা যদি তোমাকে মেরে ফেলে, তাতেও অতিরিক্ত কোন ক্ষতি নেই তোমার। এখানে থাইদের হাতে থাকলেও মরতে হবে তোমাকে। তোমার জন্যে ক'জন লোক মারা গেছে, সে-হিসেব নিশ্চয়ই মনে আছে পরিষ্কার?'

'কিন্তু...'

'ওদেরকে বলো, চাগাল ইসরায়েলে যেতে চাইছে না। কারণ

জেলখানায় বসে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে বলে আশা করছে সে। কিংবা বলো, ইসরায়েল থেকে শেষ মুহূর্তে জরুরী নির্দেশ এসেছে, প্রিন্সকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিংবা ওদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কান্নাকাটি করো। যেভাবে পারো, প্রিন্সকে ব্রিজের এদিকে পাঠাতে হবে তোমার।'

চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল টোটা।

'এই দেশে মৃত্যুদণ্ড কিভাবে দেয়া হয়, জানো তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এরা বেশির ভাগই বৌদ্ধ, প্রাণহরণ এদের জন্যে নিষিদ্ধ। তাই অপরাধীর সামনে একটা কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়, সেই কাপড়ে আঁকা থাকে টার্গেট। তোমাকে নয়, ওরা গুলি করবে ওই টার্গেটে।'

নিষ্প্রাণ পাথরের মত বসে থাকল টোটা।

'ব্রিজের মাঝখানে সাদা একটা রেখা আঁকা হয়েছে,' বলল রানা। 'ওই দাগটা পর্যন্ত হেঁটে যাবে তুমি। রেখার এপারে থাকবে, ভুলেও ওপারে পা দেবে না।' একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল ও, 'ওই রেখার ওপারে তোমার স্বাধীনতা। এপারে তোমার মৃত্যু। ওই রেখা পেরিয়ে যাবে তুমি তখনই, সুস্থ শরীরে প্রিন্স ফরহাদ যখন আমাদের হাতে ফিরে আসবেন।'

একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল একটা জীপ। দিনের প্রথম রোদ পড়ল গার্ডপোস্টের পাঁচিলে।

'হ্যাঁ,' বলল টোটা। 'চেষ্টা করে দেখব আমি।' এই ক'টা কথা বলেই হাঁপাতে শুরু করল সে।

সাথে সাথে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। একজন পুলিস অফিসার কাছেই অপেক্ষা করছিল, তার হাত থেকে হাস্কভার্না রাইফেলটা নিল ও। একটু পরই সৈনিকরা গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল টোটাকে। তার চোখের সামনে চেম্বারে ম্যাগাজিন ভরল রানা। বোল্ট টেনে ফায়ারের ঘরে সেট করল ক্যাচ।

হাস্কভার্নার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল টোটা। ওটা যেন তাকে সম্মোহিত করেছে।

'দেখতেই পাচ্ছ,' বলল রানা। 'এটা একটা হাস্কভার্না। আমার হাত কি রকম, তাও তুমি জানো। যদি ছুট দাও, যদি সিগন্যাল পাবার আগে দাগের ওপারে চলে যাও, তোমার ওপরে পুরো ম্যাগাজিন শেষ করব আমি। মনে থাকবে তো?'

ঘাড় কাত করল টোটা।

এবার ব্রিজের ওদিকের প্রান্ত থেকে ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল। গার্ডপোস্ট থেকে টেলিফোনে কথা বলছে কেউ। সোহেলকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা।

টোটা জানতে চাইল, 'কি সিগন্যাল দেবে তুমি আমাকে?'

'রাইফেল নামিয়ে নেব।'

কয়েক সেকেণ্ড পর টোটাকে নিয়ে চলে গেল ওরা। রানা ওদের পিছু নেবার আগে সোহেল জানতে চাইল, 'রাজি হয়েছে তাহলে?'

'হবে না কেন। ওর কি বাঁচার ইচ্ছে নেই?'

উঁচু একটা ছোট ঢিবির ওপর পজিশন নিল রানা। জায়গাটা ব্রিজ আর গার্ডপোস্টের মাঝখানে। ঢিবিটার ওপর কয়েকটা গাছ থাকায় ভাল আড়াল পেয়েছে ও।

সৈনিকদের টোটার কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে বলা হয়েছে, দরকার পড়লে রানার যাতে গুলি করতে কোন অসুবিধে না হয়। সাদা রেখার সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল টোটা, দু'সেকেণ্ডের জন্যে পিছন দিকে একবার মাত্র তাকাল। টেলিস্কোপিক লেন্সে চোখ রাখল রানা। দাগের ওপারে দাঁড়ানো একজন ইউনিফর্ম পরা লোকের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে টোটা। লোকটা একজন অফিসার, তার হাবভাব দেখে সেটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। ভাড়াটে সৈনিক, সন্দেহ নেই।

দু'দিক থেকেই কয়েকটা করে যানবাহন ব্রিজের মাঝখানে হাজির হয়েছে। ওখানে পৌঁছে প্রতিটি গাড়ি ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরে গেছে, যেদিক থেকে গেছে সেদিকেই মুখ করে রয়েছে ওগুলো। মিনিট কয়েক আগে ওই পক্ষের সামনের একটা গাড়ি থেকে কয়েকজন সিভিলিয়ানকে নামতে দেখেছে রানা, তাদের মধ্যে প্রিন্স ফরহাদও ছিলেন। এখনও তাঁর পরনে সউদী আরবের পোশাক। চেহারা একটু শুকনো শুকনো দেখাল, কিন্তু হাঁটাচলায় কোন আড়ষ্ট ভাব নেই। ব্রিজের এদিকে তাকিয়ে একবার তাঁকে মৃদু হাসতেও দেখেছে রানা।

এখনও কথা বলছে টোটা। তার হাবভাবে কর্তৃত্বের ছাপ লক্ষ করল রানা। হাত দুটো কোমরে রেখেছে, বুক ফুলিয়ে কথা বলছে ইউনিফর্ম পরা ভাড়াটে সামরিক অফিসারের সাথে।

যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল টোটা, দাগের এপারে, এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, পা দুটো ভুলেও নাড়েনি। অফিসারটা বারবার পিছিয়ে গেল, প্রতিবার পরামর্শ করল একজন সিভিলিয়ানের সাথে।

রেখার ওপারেই নিজের দলের লোক আছে টোটার। জানে, দাগটা টপকে একবার একটু আড়ালে যেতে পারলেই বেঁচে যাবে সে। সব দিক রক্ষা পাবে। কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে, ষাট গজ দূরত্ব কোন দূরত্বই নয় হাস্কভার্নার জন্যে। আড়াল পাওয়ার আগেই গোটা ম্যাগাজিনটা তার পিঠে আর ঘাড়ে শেষ করবে রানা।

রেখার দু'ধারে এক্সচেঞ্জ পার্টিরা অপেক্ষা করছে। তাদের খানিকটা পিছনে তৈরি হয়ে আছে সৈনিকরা। এদিকে থাই সৈনিক, ওদিকে ভাড়াটে সৈনিক। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল।

ঘামতে শুরু করল রানা। রাইফেলটার ওজন ধীরে ধীরে বাড়ছে যেন।

এখনও কথা বলছে টোটা। রীতিমত উত্তেজিত দেখাল তাকে। ঘন ঘন হাত নাড়ছে। উত্তরে বারবার এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে সামরিক অফিসার।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসল টোটা। চড়ের আওয়াজটা এতদূর থেকেও

পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। চড়টা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে টোটার প্রতিপক্ষ অফিসার। কি হত বলা যায় না, কয়েকজন সিভিলিয়ান এগিয়ে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

দু'মিনিট একা দাঁড়িয়ে থাকল টোটা। তার সামনে কোন প্রতিপক্ষ নেই। তারপর এগিয়ে এল একজন সিভিলিয়ান। ভাড়াটে অফিসার এই লোকের সাথেও পরামর্শ করছিল।

ইংরেজীতে কথা বলছে সিভিলিয়ান লোকটা। দু'একটা শব্দ অস্পষ্ট ভাবে কানে এল রানার, তার মধ্যে একটা হলো—রেসপন্সিবিলিটি।

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল টোটা। মিলিটারি এসকর্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের সাথে পরামর্শ করল সিভিলিয়ান লোকটা। সেকেন্ড-ইন-কমান্ড স্যালুট করল তাকে।

কর্কশ একটা কমান্ড শোনা গেল। টোটার সামনে থেকে সরে গিয়ে গাড়িতে বসা বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে কথা বলল সিভিলিয়ান। তারপর ফিরল প্রিন্স ফরহাদের দিকে। কি যেন বলল তাঁকে।

তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি লেন্সের দিকে তাকাল টোটা। ক্রস হেয়ারটা একবার কেঁপে গেল, কিন্তু আবার সেটাকে টার্গেটের ওপর নিয়ে এল রানা। লেন্সের ফ্রেমের বাইরে কি ঘটছে, এখন আর দেখতে পাচ্ছে না ও। তবে বুঝতে পারল, হঠাৎ করে সবাই তৎপর হয়ে উঠেছে। লোকজন হাঁটছে, গাড়ির দরজা খুলছে, ইঞ্জিন চালু হলো।

টোটার দিকে রাইফেল তাক করে থাকল রানা। যতক্ষণ না ব্যাপারটা মিটে যায়, তাকে বিশ্বাস করে না ও। ওর বাঁ চোখ ব্যথা করছে। ডান চোখের পাতায় জমেছে এককোঁটা ঘাম। রাইফেলটা এত ভারী লাগছে, মনে হচ্ছে হাত থেকে পড়ে যাবে।

ব্রিজের ওপর থেকে এপারে চলে এল একটা গাড়ি। তারপর আরেকটা।

ঘাড় ফিরিয়ে এখনও লেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে টোটা। পলক পড়ছে না তার চোখে।

পায়ের আওয়াজ পেল রানা। সোহেলের গলা শুনল। 'সব ঠিক আছে, রানা। প্রিন্স পৌঁচেছেন।'

রাইফেল নামাল রানা।

গার্ডপোস্টের কাছে পৌঁছে রানা দেখল, একটা গাড়ি থেকে নামছেন প্রিন্স ফরহাদ। রানাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন না। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। একটা চোখ টিপল রানা।

একটু ঝুঁকে গাড়ির ভেতর কাকে যেন কি বললেন প্রিন্স। তারপর এগিয়ে এলেন রানার দিকে। রানার সামনে এসে কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন, টেনে নিলেন ওকে চওড়া বুকে। বললেন, 'ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, রানা। শুধু বলব আমার সৌভাগ্য, যে তোমাকে পেয়েছি বন্ধু হিসেবে।'

www.murchona.com
suman@yahoo.com©

Sumon

A lonely man in the crowded planet